Andhokarer Gaan by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

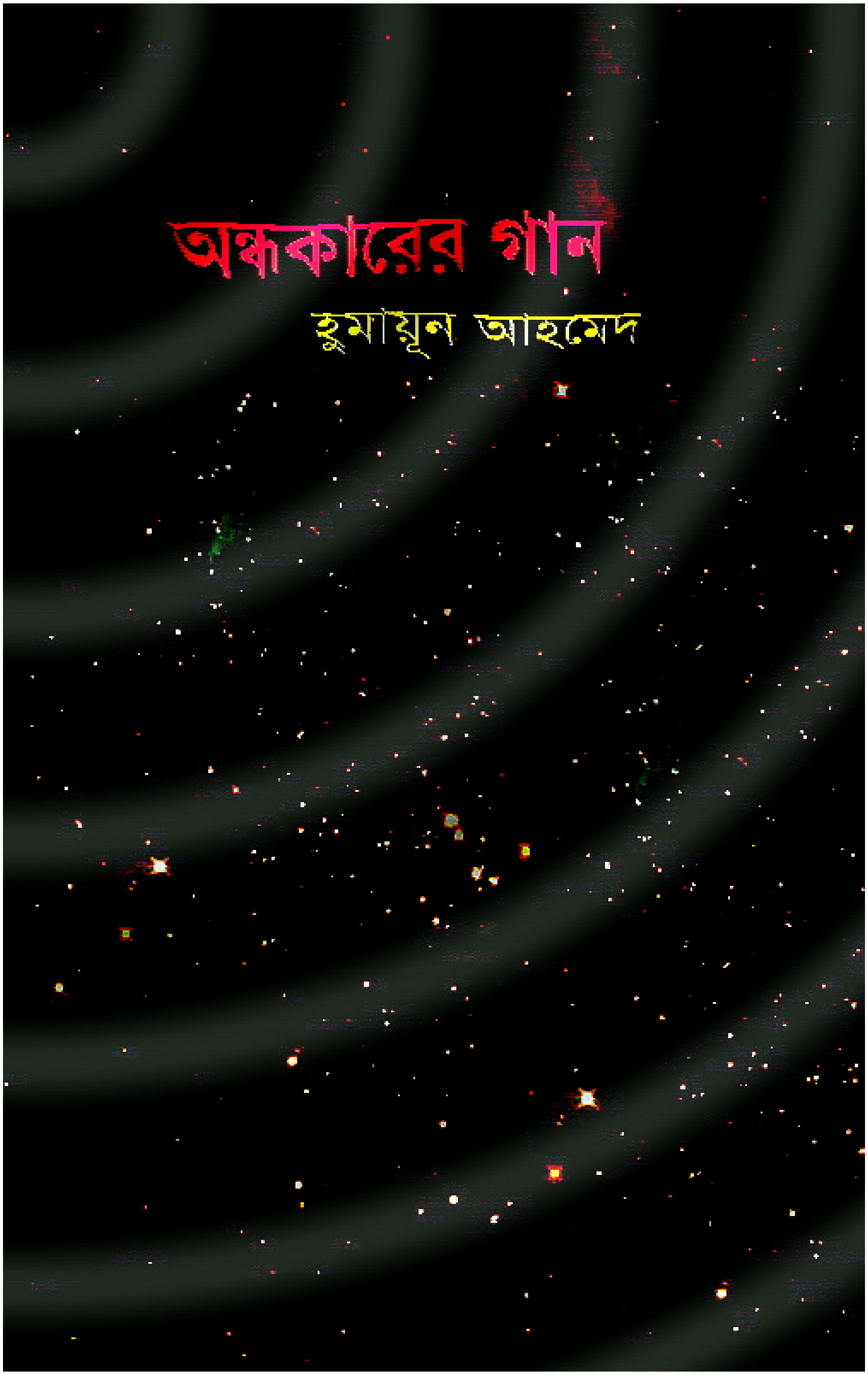
অন্ধকারের গান
হুমায়ূন আহমেদ

অন্ধকারের গান

১

বুলুদের এই বাড়ির মতো বাড়ি বোধহয় ঢাকা শহরে খুব বেশি নেই।

পুরানো আমলের হিন্দু বাড়ি। তুলসি মঞ্চ আছে। ছোট্ট একটা ঠাকুর ঘর আছে। ঠাকুর ঘরের দক্ষিণে গহীন একটা কুয়া। বাড়ির গেটে সিংহের দু'টি মূর্তি।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে, ১৯৫৮ সনে বাড়ির মালিক নিত্যরঞ্জন বাবুর কাছ থেকে বুলুর বাবা মিজান সাহেব এই বাড়ি জলের দামে কিনে নিয়েছিলেন। এত সস্তায় বাড়ি পেয়ে মিজান সাহেবের আনন্দের সীমা ছিল না। পরে দেখা গেল নিত্যরঞ্জন বাবু এই বাড়ি দু'জনের কাছে বিক্রি করেছেন এবং তৃতীয় এক জনের কাছ থেকে বায়নার টাকা নিয়েছেন। নিত্যরঞ্জন বাবুর মতো ভালোমানুষ ধরনের বোকা সোকা একটা লোক যে এই কাণ্ড করতে পারে তা মিজান সাহেব স্বপ্নেও ভাবেন নি।

মিজান সাহেবকে বাড়ির দখল নেয়ার জন্যে নানান কাণ্ড করতে হল। টাকা–পয়সা দিতে হল, কোর্ট কাছারি করতে হল। নিত্যরঞ্জন বাবুর খোঁজে একবার কোলকাতায়ও গেলেন। দেখা গেল ঠিকানাটাও ভুয়া। অনেক হাঙ্গামা করে বাড়ির দখল মিজান সাহেব পেলেন কিন্তু তাঁর কোমর ভেঙে গেল। শুরুতে তাঁর কাছে এ বাড়ি যত সুন্দর লেগেছিল বাড়িতে উঠার পর তা লাগল না। বার–বার মনে হল এই বাড়িটা ভালো না, অশুভ কিছু এখানে আছে। ছেলে–মেয়ে নিয়ে এখানে আসা উচিত হয় নি।

গেটের সিংহ দু'টিকে কোনো–কোনো রাতে জীবন্ত মনে হয়। বাড়ির পেছনের কুয়া থেকে মাঝে–মাঝে গভীর রাতে তিনি পানি ছিটানোর কল কল শব্দ পান। এ রকম শব্দ হবারও কথা নয়। হয় কেন? তিনি গেটের সিংহ দু'টি ভেঙে ফেললেন। কুয়ার কিছু করতে পারলেন না।

বুলুদের অবশ্যি এই কুয়া খুব পছন্দ। তারা যখন ছোট তখন কুয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলত—'টু টু টু।' কুয়া সেই শব্দ অনেকগুণে বাড়িয়ে ফেরত পাঠাত। পরে সেই 'টু–টু' খেলার অনেক রকমফের হল। দেখা গেল কুয়া শব্দ উল্টো করে ফেরত পাঠাতে পারে। 'বুলু' বলে চেঁচালে কিছুক্ষণ পরে শোনা যায়, 'লুবু–লুবু–লুবু।' খুবই

www.murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

মজার ব্যাপার। এক দুপুরে বুলু কুয়ার পাড়ে বসে খুব চেঁচাল—'চা–প, চা–প, চা–প।' সেই শব্দ উল্টো হয়ে ফেরত এল—'পচা, পচা, পচা।' বুলুর মহা আনন্দ।

এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। মিজান সাহেব কুয়ার ওপর ভারি পাটাতনের ব্যবস্থা করলেন। এক সময় সেই পাটাতনও গলে পচে শেষ হয়ে গেল। ততদিনে বুলুরা বড় হয়েছে। বুলুর ছোট বোন বীণা কুয়ার পাশে একটা চাঁপা গাছ লাগিয়েছে। সেই গাছও দেখতে দেখতে বড় হয়ে এক চৈত্র মাসে কিছু ফুল ফুটিয়ে ফেলল। আনন্দে বীণা গাছে হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল। গাছ সম্ভবত মানুষের ভালবাসা বুঝতে পারে। কাজেই পরের বছর আরো বেশি ফুল ফুটল। তার পরের বছর আরো বেশি। একটা ডাল ঝুঁকে এল কুয়ার ওপর। কে জানে গাছেরও হয়ত নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে ইচ্ছা করে। পুকুর পাড়ের সব গাছ সে কারণেই জলের দিকে ঝুঁকে যায়।

শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে মিজান সাহেব তাঁর স্ত্রী এবং দু'বছর বয়েসী বুলুকে নিয়ে কল্যাণপুরের এই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। শ্যাওলা–ধরা পাঁচিলের নোনা–লাগা বাড়ি, চারদিকে ঝোপ ঝাড়। বাড়ির বাঁ দিকে ডোবার মতো আছে। ডোবার চারপাশে ঘন কচুবন। তাঁদের চোখের সামনেই ডোবার পানি কেটে একটা খয়েরি রঙের সাপ চলে গেল।

ফরিদা আঁৎকে উঠে বললেন, 'কোথায় নিয়ে এলে? এ যে সাপ–খোপের আড্ডা

মিজান সাহেব বললেন, 'সব সময় ফালতু কথা বলবে না। ফালতু কথা আমার মোটেই ভালো লাগে না।'

ফরিদা থমথমে গলায় বললেন, 'চারদিকে একটা বাড়ি ঘর নেই। ডাকাত মেরে রেখে গেলেও কেউ জানবে না। তুমি থাকবে বাইরে–বাইরে আমি ছোট একটা বাচ্চা নিয়ে এত বড় বাড়িতে থাকতে পারব না। আমাকে তুমি দেশে পাঠিয়ে দাও।'

মিজান সাহেব বললেন, 'আবার ফালতু কথা শুরু করলে?'

'এখানে থাকব কী করে?'

'প্রথম দিনেই বড় যন্ত্রণা শুরু করলে তো?'

মিজান সাহেব ভুরু কুঁচকে এমনভাবে তাকালেন যে ফরিদা চুপ করে গেলেন। তবে তাঁর মনটা ভেঙে গেল। প্রথম রাতে একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে ভয়ও পেলেন। বারান্দায় হাত ধুতে এসে দেখেন কুয়ার পাশে লম্বা ঘোমটা দিয়ে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বিকট চিৎকার দিলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'ফালতু কথা বলা তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে, জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে আর তুমি বলছ হেন তেন।'

এক শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে তিনি এই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। আজ আরেক শ্রাবণ মাস। মাঝখানে চব্বিশ বছর পার হয়েছে। তাঁর সংসার বড় হয়েছে। বীণার জন্ম হয়েছে ঢাকা আসার পরের বছর। তার পরের বছর আরেকটি শিশুর জন্ম দিয়ে ফরিদার শরীর ভেঙে গেল। মাথার চুল উঠে গেল, বুকে ফিক ব্যথা। সামান্য কিছুতেই বুক ধড়ফড় করে। ফর্সা মুখ নীল হয়ে যায়।

লম্বা ঘোমটা পরা মেয়েটাকে এখনো ফরিদা হঠাৎ–হঠাৎ দেখেন তবে কাউকে কিছু বলেন না। চুপ করে থাকেন। ছেলেমেয়েরা শুনলে ভয় পাবে। কী হবে ওদের ভয় দেখিয়ে? তাছাড়া ঐ ঘোমটা দেয়া মেয়ে তো তাঁর কোনো ক্ষতি করছে না। এই

অশরীরী মেয়ে নিজের মনে আসে। হঠাৎ-হঠাৎ দেখা দিয়ে চলে যায়।

কুয়ার ভেতরের সেই কল কল শব্দ মিজান সাহেবও মাঝে-মাঝে শোনেন। তিনিও কিছু বলেন না। চুপ করে থাকেন। সেইসব রাতে তাঁর একেবারেই ঘুম হয় না। বারান্দায় জলচৌকিতে বসে রাত কাটিয়ে দেন।

মিজান সাহেব যতটা আশা নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন তার কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনোরকম উন্নতি তিনি করতে পারেন নি। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর পর লবণ এবং পেঁয়াজের ব্যবসা করে কিছু টাকা করেছিলেন, সেই টাকায় বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় একটা ঘর তোলা শুরু করেছিলেন। ছাদঢালাই হবার আগেই কাজ বন্ধ হয়ে গেল। চিটাগাং থেকে বুক করা দুই ওয়াগন লবণ আখাউড়া পর্যন্ত এসে উধাও হয়ে গেল। কত ছোটাছুটি, কত লেখালেখি, উকিলের চিঠি, একে ধরা, তাকে ধরা। লাভ হল না। দেশে আইন-কানুন নেই। যার যা ইচ্ছা করছে। সে অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত।

এক বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন কন্ট্রাক্টারি করলেন। এ দেশে কন্ট্রাক্টারি করে মানুষ ধনবান হয়। তিনি হলেন নিঃস্ব। সেই বন্ধুর কল্যাণে জেলে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পৈত্রিক জমি-জমা বিক্রি করে অনেক কষ্টে তা ঠেকালেন।

মা বাবাকে দেশের বাড়ি থেকে উঠিয়ে এখানে এনে রাখলেন। তাঁর বাবা দেশের বাড়িতে সুখেই ছিলেন। এখানে এসে বড়ই অসহায় হয়ে পড়লেন। বেশিরভাগ সময় কুয়াতলায় বসে থাকতেন। যখন তখন চিকন গলায় বলতেন, 'কোনহানে আনলিরে মিজান? ও বাপধন কোনহানে আইন্যা ফেললি? দমডা বন্ধ হইয়া যায়। খোলা বাতাস নাই।'

মিজান তিক্ত গলায় বলতেন, 'খোলা বাতাস, খোলা বাতাসের দরকারটা কি তোমার?'

'জানটা খালি শুকাইয়া আছে।'

'বড় যন্ত্রণা করছ বাবা তুমি। বড়ই যন্ত্রণা করছ।'

মিজান সাহেবের বাবা দীর্ঘদিন যন্ত্রণা দিলেন না। ভাদ্র মাসের এক দুপুরে হঠাৎ করে মরে গেলেন। তবে মেয়েদের জীবন বেড়ালের জীবনের মতো। কিছুতেই সে জীবন বের হতে চায় না। মিজান সাহেবের মা বেঁচে রইলেন। তিনি চোখে এখন প্রায় দেখতেই পান না। বোধ শক্তিও নেই। গায়ের কাপড় ঠিক থাকে না। মিজান সাহেবের সবচে ছোট ছেলে বাবলু কোনো কোনো দিন দাদীর ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'দাদী নেংটা, ছি ছি দাদী নেংটা।'

পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা বাবলুর চেয়েও উচু গলায় চেঁচান, 'মর হারামজাদা মর। বদের বদ। শয়তানের শয়তান। মর তুই মর।' এই জাতীয় গালি শুনলে সব সময় ফরিদার গা কাঁপে তবে তাঁর শাশুড়ির গালিতে তিনি খুব একটা বিচলিত হন না। কোথায় যেন শুনেছেন রক্ত সম্পর্কের মুরব্বী যদি মর-মর করে গালি দেয় তাহলে আয়ু বাড়ে।

পঁচাশি বছরের বৃদ্ধাও বাড়ির সকলের আয়ু ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেন। শুধু মানুষ না—জীব-জন্তু, পশু-পাখির আয়ুও তিনি বাড়ান। একটা কাক হয়ত ডাকছে কা-কা। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গালি দেবেন, 'মর হারামজাদা মর।' ভাত খাবার সময় পাশ দিয়ে একটা বেড়াল গেল, তিনি চেঁচাবেন, 'মর হারামজাদা বিলাই। তুই মর।'

মিজান সাহেবের মাঝে-মাঝে অসহ্য বোধ হয়। তিনি তীব্র গলায় বলেন, 'চুপ।' তাঁর মা তার চেয়েও উঁচু গলায় বলেন, 'তুই চুপ। হারামজাদা ছোড লোক। আমারে বলে চুপ। মর হারামজাদা।'

মিজান সাহেবের সত্যি-সত্যি মরতে ইচ্ছা করে। সংসার বড় হচ্ছে। তিনি সামাল দিতে পারছেন না। মাঝে-মাঝে রাতে তাঁর একেবারেই ঘুম হয় না। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন। মাথার দু'পাশের রগ দপদপ করে। সত্যি-সত্যি তিনি যদি মরে যান তাহলে এই সংসারটার কী হবে এটা ভাবলে শরীর অবশ হয়ে আসে। তাঁর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না, তবু শুধু সংসারের জন্যে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে এই চিন্তা তাঁকে কাবু করে ফেলে। তাঁর অসহ্য বোধ হয়। অসহ্য বোধ হলেও তিনি ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মে প্রতিদিন তাঁর জীবন শুরু করেন। বাজার করেন, অফিসে যান, অফিস থেকে ফিরে মার ঘরে উঁকি দিয়ে বলেন, 'কেমন আছ মা? আজ শরীরটা কেমন?' বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, 'মর হারামজাদা। রোজ ঢং করে।'

মিজান সাহেব বর্তমানে মেঘনা এন্টার প্রাইজেস লিমিটেডের ক্যাশিয়ার। এই প্রাইভেট কোম্পানির অনেকরকম ব্যবসা—ট্রান্সপোর্ট, ইন্ডেন্টিং, কেমিক্যালস এবং হোটেল। মিজান সাহেবের হাত দিয়ে রোজ যে পরিমাণ টাকার লেন-দেন হয় তা দেখে তিনি বিস্ময় বোধ করেন। দেশের কিছু কিছু মানুষের হাতে এত টাকা কী করে চলে আসছে তিনি তা ভেবে পান না। মেঘনা এন্টার প্রাইজেসের মালিক—ওসমান গনি। ছোট-খাটো মানুষ। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। থুতনীতে অল্প কিছু দাড়ি। ধবধবে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দেন। চোখে সামান্য সুরমা দেন। রিভলভিং চেয়ারে পা তুলে বসেন। ঘন-ঘন পান খাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বদ অভ্যাস নেই। গলার স্বর খুবই মোলায়েম। ব্যবহারও ভদ্র। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হলে তিনি সবার আগে বলেন, 'স্লামালিকুম।' চড়া গলায় কারো সঙ্গে একটা কথাও বলেন না। তবু সবাই তাঁর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। এই ভয়ের উৎস গনি সাহেবের ব্যক্তিত্ব নয়—ক্ষমতা। ক্ষমতা বড়ই শক্ত জিনিস।

গনি সাহেবের কয়েকটি অফিস আছে। প্রতিটি অফিসে তাঁর একজন প্রিয়পাত্র আছেন। এই সব প্রিয়পাত্রদের প্রতিদিনই তিনি কিছুটা সময় দেন। নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে নানান গল্প করেন। অন্যদের সঙ্গে তিনি কী গল্প করেন কে জানে কিন্তু মিজান সাহেবের সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তু একটাই। তা হচ্ছে—গনি সাহেবের বয়স হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো একদিন মরে যাবেন। মরবার আগে দেশের জন্যে তিনি কিছু করতে চান। টোটকা-ফাটকা কিছু না। স্থায়ী কিছু। গনি সাহেব, মধুর স্বরে জানতে চান—'কী করা যায় বলুন দেখি মিজান সাহেব? স্কুল-কলেজের কথা আমাকে বলবেন না। এই জাতিকে লেখাপড়া শিখিয়ে কিছু হবে না। অন্য কিছু ভাবুন। চট করে বলার দরকার নেই। চিন্তা ভাবনা করুন। আমি নিজের কোনো নাম চাই না। আমি চাই টাকাটা কাজে লাগুক। বুঝতে পারছেন?'

বুঝতে না পেরেও মিজান সাহেব 'হ্যাঁ সূচক' মাথা নাড়েন। মাসের মধ্যে এক দু'দিন গনি সাহেবকে দেশ নিয়ে খুবই চিন্তিত মনে হয়। সুরমা পরা চোখে দেশের জন্যে মমতা ঝরে পড়ে। তিনি উদাস গলায় বার-বার বলেন, 'চিন্তা করে কিছু বের করুন। ভাবুন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন।'

www.Murchona.com

মিজান সাহেব ভাবেন। তবে দেশ নিয়ে না। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন। ইদানীং তিনি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছেন। বুলু এইবারও পাশ করতে পারে নি। তিনবার বি.এ ফেল করলে আর কোনোবারই পাশ করতে পারে না। এটাই নাকি নিয়ম। পাশ যারা করার তারা প্রথম দু'বারেই করে। যারা করার না তারা আর করে না।

বুলু পাশ করতে পারল না অথচ বীণা এত ভালো রেজাল্ট করল। বীণার এই রকম রেজাল্টের দরকার ছিল না। দু'জন যদি কোনোমতে টেনে-টুনেও পাশ করত তিনি খুশি হতেন।

শ্রাবণ মাসের এই মেঘলা সকালে মিজান সাহেব রেজাল্টের পত্রিকা হাতে বারান্দায় জলচৌকির উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। বুলু বোধ হয় আগেই খবর পেয়েছে। সে গতরাত থেকে বাসায় নেই। ফরিদা খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করে এখন নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। তাঁর বুকের ফিক ব্যথা আবার উঠেছে।

বীণা কুয়ার পাশে একা একা বসে আছে। সেও খানিকক্ষণ কেঁদেছে। বি.এ পরীক্ষায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় হবার কোনো দরকার ছিল না। সে তো এমন কোনো ভালো ছাত্রী না। ম্যাট্রিকে একটা মাত্র লেটার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছিল। অথচ তার বান্ধবীরা চারটা পাঁচটা করে লেটার পেয়েছে। ইন্টারমিডিয়েটেও অনেক কষ্টে একটা ফার্স্ট ডিভিসন। এই গুলোও কোনো কাজে লাগল না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় এ্যালাউ হল না।

বীণার খুব খারাপ লাগছে তার দাদার জন্যে। বেচারা এ বছর খুব পরিশ্রম করেছে। তবু এ রকম হল কেন কে জানে। বেচারা সোজা সরল ধরনের মানুষ। একা একা কোথায় ঘুরছে কে জানে। সে ফেল করে তার দাদা পাশ করলে আনন্দের একটা ব্যাপার হত। বাবা নিশ্চয়ই মিষ্টি আনতেন। সে তার নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে থাকত। এক সময় বাবা বলতেন, 'এত কান্নাকাটির কি আছে? পাশ ফেল ভাগ্যের ব্যাপার। পরের বছর আরেকবার দিলেই হবে।'

আবহাওয়া সহজ হয়ে যেত। বাবাকে জলচৌকির ওপর মুখ শুকনো করে বসে থাকতে হত না। ফিক ব্যথা উঠত না। বীণাকে একা একা কুয়ার পাশে থাকতে হত না।

কিংবা তারা দুই ভাই-বোনই যদি পাশ করত তাহলে কি অদ্ভুত একটা ব্যাপার হত। দু'জনে মিলে সালাম করত বাবা মাকে। বাবা গম্ভীর গলায় বলতেন, 'থাক-থাক সালাম লাগবে না।' বলতে বলতে গাম্ভীর্যের কথা ভুলে তরল গলায় নিশ্চয় বলতেন, 'ফরিদা, মিষ্টি-টিষ্টির ব্যবস্থা কর।'

বীণা এক দৃষ্টিতে কুয়ার পানির দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ নিচু করে একবার সে বলল, 'নাবী, নাবী।' কিছুক্ষণের মধ্যেই কুয়া গম্ভীর গলায় ডাকল, 'বীণা। বীণা।' কুয়া কি চমৎকার করেই না মানুষের মতো ডাকে। প্রাচীন এক জন মানুষ, যার গলার স্বরে ব্যাখ্যার অতীত কোনো রহস্যময়তা।

'আপা, এই আপা।'

বীণা পেছনে ফিরল। লীনা পা টিপে টিপে আসছে। বীণা বলল, 'কিরে?'

'বাবা চা খেতে চাচ্ছে।'

বীণা রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। তার পেছনে পেছনে লীনা আসছে। সে

ফিস-ফিস করে বলল, 'তুমি ফার্স্ট হয়েছ আপা?'

'না।'

'পত্রিকায় তোমার ছবি উঠবে না?'

বীণা কিছু বলল না। লীনা বলল, 'ওরা তোমার ছবি কোথায় পাবে আপা?'

'জানি না। এত কথা বলিস না, ভালো লাগছে না।'

বীণা চা বানিয়ে বাইরে এসে দেখে বাবা নেই। কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন। খবরের কাগজটা কুচি-কুচি করে ছেঁড়া।

লীনা বলল, 'চা আমাকে দাও আপা আমি খেয়ে ফেলি।'

বীণা চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। মার জন্যে হালকা করে সাগু বানাল। সাগু খেলে ব্যথা খানিকটা কমে। ফরিদার ব্যথা কমল না। তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

মিজান সাহেব বাসায় ফিরলেন সন্ধ্যা মিলাবার পর। তাঁর হাতে একগাদা কাগজপত্র। ক্যাশের হিসাবে গণ্ডগোল হচ্ছে। রাত জেগে হিসাব মিলাবেন। তিনি হাত মুখ ধুয়ে খাতা নিয়ে বসলেন। পাশের ঘরে ফরিদা ছটফট করছেন—তা নিয়ে মোটেই বিচলিত হলেন না। কখনো হন না।

বীণা এসে বলল, 'চা দেব বাবা?'

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না।

বীণা চা বানিয়ে বাবার পাশে রাখল। বাবার কাছাকাছি সে বেশিক্ষণ থাকে না। খুব ভয়-ভয় লাগে। আজ অন্যদিনের চেয়েও বেশি ভয় করছে। বীণা চলে যেতে ধরেছে—মিজান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'বোস।'

বীণা হকচকিয়ে গেল। বসল না। মিজান সাহেব পকেট থেকে একটা ছোট্ট চৌকা বাক্স বের করে মৃদু স্বরে বললেন, 'নে।'

বীণা হাত বাড়িয়ে নিল। বাক্স খুলে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটা সোনালি হাত ঘড়ি। বীণা কী করবে ভেবে পেল না। মিজান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'এত ভালো রেজাল্ট করেছিস—বাবা মাকে তো সালাম করলি না? সালাম কর মা।'

রাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। দমকা বাতাসের ঝাপটা। সারা বাড়িতে একটা মাত্র হারিকেন। মিজান সাহেব সেই হারিকেনে খাতাপত্র দেখছেন। লীনা এবং বাবলু অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে। আপার ঘড়িটা লীনা হাতে পরেছে। তার বড় ভালো লাগছে।

বীণা রান্নাঘরে। চুলার আগুনের সামান্য আলোতেই রান্নার কাজ সারতে হচ্ছে। ফরিদা তার পাশে বসে আছেন। তাঁর ব্যথা পুরোপুরি সেরে গেছে তবে শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে।

মিজান সাহেব অনেক রাতে শুতে গেলেন। ঝড় থেমে গেছে তবু অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। শীত লাগছে, কাঁথা বের করতে হয়েছে। মিজান সাহেব বিছানায় উঠতে উঠতে বললেন, 'ফরিদা জেগে আছ নাকি?'

ফরিদা বললেন, 'হ্যাঁ।'

'বীণার হাত-টাত একেবারে খালি। ছোট-খাটো কিছু গয়না গড়িয়ে দিও। এই বয়সে শখ থাকে। আমি টাকার ব্যবস্থা করব।'

ফরিদা কিছু বললেন না। মিজান সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, 'কাল কিছু মিষ্টি

টিষ্টি আনিও। মেয়েটা এত ভালো করেছে। পাশের বাসায় দিও।'

'আচ্ছা'

'বুলু আসে নি?'

'না।'

'জুতিয়ে হারামজাদার আমি বিষ ঝাড়ব।'

ফরিদা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ছেলেটা কোথায় ঘুরছে কে জানে। রাতে হয়ত কিছু খায়ও নি।

বীণা তার দাদীর সঙ্গে এক খাটে ঘুমায়। রাতে যখন বীণা ঘুমুতে আসে তখন এই অপ্রকৃতিস্থ বৃদ্ধা সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন। বীণার তখন ধারণা হয় দাদী আসলে ভালোই আছেন। পাগলামী যা করেন তা বোধ হয় ভান।

আজ বীণা ঘুমুতে এসে দেখল দাদীর গায়ের ওপরের অংশে কোনো কাপড় নেই। শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে রেখেছেন।

বীণা বলল, 'শাড়ি ঠিকমতো পর দাদী, বিশ্রী লাগছে।'

'গরম লাগে।'

'খুব খারাপ দেখায় দাদী।'

'দেখাইলে দেখায়। তুই ঘুমা।'

বীণা শুয়ে পড়ল। দাদী বসেই রইলেন। বীণা বলল, 'ঘুমুবে না দাদী?'

'উহু।'

'আমি পাশ করেছি দাদী।'

'বুলু ফেল হইছে?'

বীণা কিছু বলল না।

'ঐ হারামজাদা আছে কোন হানে?'

'ঘুমাও দাদী।'

দাদী শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণেই তাঁর নাক ডাকতে লাগল। তাঁর ঘুম চট করে আসে আবার চট করে চলেও যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে। তখন অনবরত কথা বলতে থাকবেন।

বীণার ঘুম আসছে না, শুয়ে শুয়ে সে নানান কথা ভাবছে। কাল সে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একা একা খানিকক্ষণ ঘুরবে। অলিকের বাসা খুঁজে বের করতে পারলে একবার যাবে দেখা করতে। অলিকের কথা তার প্রায়ই মনে হয়।

দাদীর ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি উঠে বসলেন, টেনে টেনে বললেন, 'বুলুটা কি আবার ফেইল করল? ও বীণা, ঐ হারামজাদা আবার ফেইল করল? পর–পর তিনবার। হারামজাদার লজ্জা নাই? ও বীণা ঘুমালি?'

বীণা ঘুমায় নি কিন্তু সে জবাব দিল না। জবাব দিলে দাদী অনবরত কথা বলতে থাকবেন।

'ও বীণা। বীণা।'

জবাব দেবে না দেবে না করেও বীণা বলল, 'কি দাদী?'

'তোর বাপ তোর বিয়ার ব্যবস্থা করে না ক্যান?'

'চুপ কর তো দাদী।'

'তোর বাপরে আমি বলব। তোর বাপটার মাথা খারাপ—এত বড় মাইয়া ঘরে...

'চুপ কর দাদী। তুমি বিশ্রী সব কথা বল।'

'শরম লাগে?'

'ইস্ কি যে যন্ত্রণা। হ্যাঁ শরম লাগে।'

বুড়ি গা দুলিয়ে খিক খিক করে হাসে। মাঝে-মাঝে রাত দুপুরে তাঁর মনে ফুর্তির ভাব আসে। আজ বোধ হয় সে রকম একটা রাত। বুড়ি নিচু গলায় মেয়েদের যৌবন নিয়ে এমন একটা কথা বলল যে বীণার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

২

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর অলিকের একটা বিশ্রী অভ্যাস হয়েছে—দুপুরে ঘুমানো। তাদের সব ক্লাস দেড়টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। একটা সাবসিডিয়ারি ক্লাস আছে—তিনটায়। সপ্তাহে একদিন। সাবসিডিয়ারির স্যার একদিন আসেন তো তিন দিন আসেন না। পড়ানোরও কোনো আগা মাথা নেই, একদিন যেটা পড়ালেন পরদিন আবার সেটাই শুরু করলেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে রাগী-রাগী গলায় বলেন, 'বেশি বুঝতে চেষ্টা করবে না। যতটুকু বোঝার ততটুকুই বুঝতে চেষ্টা কর। নো মোর, নো লেস।'

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অলিকের মোহ কেটে গেছে। সাবসিডিয়ারি ক্লাসে যাওয়া সে ছেড়ে দিয়েছে। অনার্স ক্লাসও সব কটি করা হয় না। তার ধারণা একটি ক্লাস না করেও ঘরে বসে পড়ে সে চমৎকার রেজাল্ট করে বের হয়ে আসবে। তবে কোনো-কোনো টিচার রোল কল করেন। যে কারণে তাঁদের ক্লাস করতে হয়। ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস খুব মজার হবার কথা, তা হয় না। অধিকাংশ ক্লাসই অঙ্কের ক্লাসের মতো মনে হয়। সাহিত্য এত রসকষহীন হবে জানলে সে ইকনমিক্স কিংবা সাইকোলজি নিয়ে নিত।

আজ বুধবার বি আর এর ক্লাস। এই ক্লাসটা মোটামুটি ভালোই হয়। বি আর মন্দ পড়ান না। 'প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস' পড়তে ভালোই লাগে। যদিও উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ওপর রাগে গা জ্বলে যায়।

অলিক ক্লাসে গিয়েছিল। ক্লাস হল না। তাদের ক্লাস রুমের ঠিক সামনে একটা বোমা ফেটেছে। মেঝেতে ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়ানো। বোমা ফাটার কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্যি সব শান্ত তবু বি আর ক্লাস নিলেন না। বিরক্ত মুখে বললেন, 'পড়াশোনা করে কী হবে? যাও বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও।' অলিক স্যারের কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছে। বাড়িতে এসে কিছু না খেয়েই ঘুম। দরজার বাইরে হাতে লেখা নোটিশ—দয়া করে বিরক্ত করবেন না।'

কেউ তাকে বিরক্ত করল না। অবশ্যি বিরক্ত করার মানুষও এ বাড়িতে নেই। বাবা বনানী থেকে ফিরবেন রাত আটটার দিকে। বনানীতে তাদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ঐ নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত। এ বাড়িতে অন্য যারা আছে তারা অলিককে বেশ ভয় করে। যদিও ভয় করার তেমন কোনো কারণ নেই। অলিক কারো সঙ্গেই উঁচু গলায় কথা বলে না।

তার ঘুম ভাঙল বিকেলে। বিকেলে ঘুম ভাঙলে তার খুব অস্থির লাগে। কেন লাগে কে জানে। তখন খুব এক জন প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে। মুশকিল হচ্ছে অলিকের তেমন কোনো প্রিয়জন নেই। মাঝে–মাঝে ঘুম ভাঙা মাত্রই সে টেলিফোন তুলে চোখ বন্ধ করে ছ'টা নাম্বার ঘুরায়। বেশিরভাগ সময় কোনো শব্দ হয় না। আবার মাঝে–মাঝে রিং হয়। তখন দারুণ উত্তেজনার একটা ব্যাপার ঘটে—কে টেলিফোন ধরবে? একটি ছেলে ধরবে, না মেয়ে? যদি কোনো ছেলে ধরে তাহলে সে কেমন ছেলে? বুদ্ধিমান না ইডিয়ট শ্রেণীর? ওপার থেকে উদ্বিগ্ন গলা শোনা যায়, 'হ্যালো কে বলছেন?' হ্যালো। 'অলিক টেলিফোন নামিয়ে রাখে।'

আজ ঘুম ভাঙামাত্র অভ্যাস মতো হাত বাড়িয়ে টেলিফোন রিসিভার টেনে আনল। চোখ বন্ধ করে ছ'টা নাম্বার ডায়াল করল।। রিং হচ্ছে কেউ ধরছে না। পাঁচবার রিং হবার পর অলিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। দরজা খুলে ময়নার মাকে বলল, চা এবং কিছু খাবার দিতে।

ময়নার মা ভয়ে–ভয়ে বলল, 'আপনের কাছে কে এক জন আসছে। অনেকক্ষণ হইছে।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'মেয়ে।'

'আগে কখনো এ বাড়িতে এসেছিল?'

'না।'

'তাহলে চলে যেতে বল।'

'উনার নাম বীণা। বলছে আপনের বন্ধু।'

'চলে যেতে বল। বীণা নামের কাউকে আমি চিনি না। গায়ে কাপড় কী? শাড়ি না কামিজ?'

'শাড়ি।'

'শাড়ির রঙ কি?'

'সাদার মধ্যে নীল ফুল।'

'বড় বড় ফুল না ছোট ছোট ফুল?'

ময়নার মা মনে–মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই আপা বড় যন্ত্রণা করে। মাথা খারাপ করে দেয়।

'মেয়েটার চেহারা কেমন?'

'সুন্দর।'

'আমার চেয়েও সুন্দর?'

'অত জানি না আফা। আপনেও সুন্দর উনিও সুন্দর।'

অলিক নিচে নেমে এল। মেয়েটি যদি সুন্দর হয় তাহলে এক নজর দেখা যেতে পারে। সে মনে–মনে বলল—I Loved a love once, fairest among women, closed her doors on me, I must not see her.' এই কবিতাটা সে গত সপ্তাহে মুখস্থ করেছে। প্রতি সপ্তাহে সে একটা করে কবিতা মুখস্থ করার পরিকল্পনা করেছে। এই সপ্তাহে সুইনবার্নের কবিতা মুখস্থ করার কথা। এখনো কবিতা সিলেক্ট করা হয় নি।

www.Murchona.com

'আরে বীণা তুই?'

অলিক প্রায় ছুটে গিয়ে বীণাকে জড়িয়ে ধরল। এবং সেখানেই থেমে থাকল না, বীণাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল সোফায়, তবুও ছাড়ল না। গাঢ় গলায় বলল, 'তুই আমার ঠিকানা পেলি কোথায়?'

'মালবী দিয়েছে।'

'তোর কথা আমি কত ভেবেছি। বিশ্বাস কর।'

'দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাত ছাড়।'

'না ছাড়ব না। I loved a love once, I must not see her.'

'তুই আগের চেয়েও পাগল হয়েছিস অলিক।'

অলিক হাত ছেড়ে দিল এবং গম্ভীর হয়ে বলল, 'একটা খবর আছেরে বীণা—মা মারা গেছে।'

'সে কী!'

'I was so happy, খুবই আনন্দ হয়েছিল।'

'চুপ কর।'

'সত্যি কথা বলছি বীণা। মার মৃত্যু আমার জন্যে আনন্দের ছিল।'

বলতে বলতে অলিকের চোখে পানি এসে গেল। বীণা অবাক হয়ে বান্ধবীকে দেখছে। কি সুন্দর হয়েছে অলিক। চোখ ফেরানো যায় না, এমন সুন্দর। স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। গায়ের রঙ হয়েছে আরো উজ্জ্বল। চোখ দু'টি গভীর কালো। কালো চোখে পানি টলমল করছে। যেন তুলিতে আঁকা ছবি।

অলিক, শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে খুবই সহজ গলায় বলল, 'মাকে পুরো এগার মাস কষ্ট করতে দেখলাম। সে যে কী অমানুষিক কষ্ট—তুই বিশ্বাস করতে পারবি না। মনে হচ্ছে জীবন্ত একটা প্রাণীর গা থেকে টেনে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে।'

'চুপ কর। শুনতে চাই না।'

'না তোকে শুনতে হবে। শেষ ক'মাস মা শুধু বলত, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে মেরে ফেল। প্লিজ প্লিজ।'

আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। বুঝলি, একদিন সত্যি-সত্যি মার জন্য বিষ কিনতে গেলাম। নিউ মার্কেটের একটা ওষুধের দোকানে। দোকানদার ভাবল আমি বোধহয় পাগল।'

'খালার কী হয়েছিল?'

"কেউ জানে না—কী চামড়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বিলেতের ডাক্তাররা বললেন, 'এ রেয়ার স্কিন ডিজিজ।' গায়ের পুরো চামড়া পাল্টে নতুন চামড়া লাগালেই শুধু ঠিক হবে। বীণা তুই আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার কথা বলার কেউ নেইরে। আয় আমার ঘরে আয়। আমার সঙ্গে ভাত খাবি।"

'এখন ভাত খাব কী? পাঁচটা বাজে।'

'আমি দুপুরে খাই নি, বড্ড ক্ষিদে লেগেছে। আয় বীণা, না করিস না। না বললে আমার খুব খারাপ লাগবে। I might cry.'

বীণা অলিককে তার পাশের খবর দিতে এসেছিল, সে তার কোনো সুযোগ পেল

না। অলিক অনবরত কথা বলছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে বলছে, 'কথা বলার লোক পা না বীণা। এই জন্যে এত কথা বলছি। রাগ করছিস না তো?'

'না, রাগ করছি না।'

'আচ্ছা তোর ঐ দাদী, এখনো বেঁচে আছেন? ঐ যে একবার দেখতে গেলাম। পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। তুই পরিচয় করিয়ে দিলি—দাদী, আমার বান্ধবী। আর উনি আমাকে বললেন, মর হারামজাদী।'

বীণা অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'উনার মাথার ঠিক নেই অলিক।'

'সেই জন্যেই তো উনাকে আমার এত পছন্দ। আমারো মাথার ঠিক নেই। উনি কি এখনো বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'জানতাম বেঁচে আছেন। পাগলরা দীর্ঘজীবী হয়। আমিও অনেকদিন বাঁচব।'

অলিক সত্যি-সত্যি পাগলের মতোই হাসতে লাগল। বীণা বলল, 'তোর স্বভাব-চরিত্র এতটুকু বদলায় নি। আগে ইংরেজিতে কবিতা লিখতি, এখনো লিখিস?'

অলিক জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে হাসছে। নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে।

এই অদ্ভুত মেয়েটা বীণাদের কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে এসে ভর্তি হল। চশমা চোখের রোগা লম্বা একটি ধারাল চেহারার মেয়ে। কেমন যেন জড়ানো গলায় কথা বলে। কথা বলার সময় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। একবারও চোখের পাতা ফেলে না। প্রথম দিনেই তার নাম হয়ে গেল সর্পরাণী। কারণ সাপ চোখের পাতা ফেলে না—সাপের চোখের পাতা নেই।

সপ্তাহখানেক পর একদিন টিফিন টাইমে বীণা টিফিন খাচ্ছে, অলিক এসে উপস্থিত। চোখে পলক না ফেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে নিলাম। কারণ একমাত্র তুমিই আমাকে সর্পরাণী বল নি আর সবাই বলেছে।'

বীণা কী বলবে বুঝতে পারল না। অলিক তার পাশে বসে সহজ স্বরে বলল, 'এখন আমরা বন্ধু হয়েছি। কাজেই আমি আমার জীবনের একটি গোপন কথা তোমাকে বলব। আর তুমি বলবে তোমার জীবনের গোপন কথা। ঠিক আছে?'

বীণা হকচকিয়ে বলল, 'আমার জীবনের কোনো গোপন কথা নেই।'

'আমার আছে। আমারটা আমি বলছি তোমার জীবনে যদি কখনো কোনো গোপন কথা হয় আমাকে বলবে কেমন?' এই বলেই খুবই অবলীলায় অলিক তার জীবনের কথাটা বলল—

''আমাদের বাসায় অনেকগুলো বাথরুম। কিন্তু বাথটাব আছে শুধু একটা বাথরুমে। ঐ বাথরুমটা সবার ঘরের সঙ্গে লাগানো। আমি কী করি জান? গরমের সময় সব কাপড় ছেড়ে বাথটাবের ভেতর শুয়ে শুয়ে বই পড়ি। একদিন হঠাৎ আমার মনে হল, কেউ যেন আমাকে দেখছে। অথচ দেখার কোনো উপায় নেই। কী হোল দিয়ে কিছু দেখা যায় না অথচ রোজ আমার মনে হয় কেউ আমাকে দেখছে। একদিন বুঝলাম সত্যি-সত্যি দেখছে। ইলেকট্রিকেল ওয়ারিং-এর জন্যে উপর দিয়ে যে ফুটো করা আছে সেই ফুটো দিয়ে আমাকে দেখছে। আমি শুধু লোকটার চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম তবু তাকে চিনলাম। চোখ দেখে মানুষকে চেনা যায়। লোকটা হচ্ছে আমাদের অনেক

দূরের আত্মীয়, সম্পর্কে আমার মামা হন, বাবার কারখানায় কাজ করেন।'

'তুমি কী করলে, সবাইকে বলে দিলে?'

'না। একদিন তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে বললাম, মামা আমাকে যে আপনার এত দেখতে ইচ্ছা করে তা তো জানতাম না। আমাকে বললেই হত। আপনি এত কষ্ট করে দেখেন। মানুষের শরীর তো এমন কিছু না যে কেউ দেখলেই পচে যাবে। এরপর যদি কখনো আপনার দেখতে ইচ্ছা করে আমাকে বলবেন। কষ্ট করার কোনো দরকার নেই। এই বলেই আমি চলে এলাম। তারপর আর কোনোদিন উনি উঁকি দেন নি। গল্পটা মজার না?'

বীণা মনে-মনে ভাবল, 'মেয়েটা বদ্ধ উন্মাদ। এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় না হওয়াই বোধহয় ভালো। বন্ধুত্বের প্রশ্নই ওঠে না।'

তবু বন্ধুত্ব হল। এরকম বন্ধুত্ব যে হাত ধরে বসে না থাকলে ভালো লাগত না। চার মাস মেয়েটি তাদের কলেজে রইল তারপর হঠাৎ একদিন ক্লাসে এসে বলল—তার মা অসুস্থ। মাকে নিয়ে সে বিলেত যাচ্ছে। এর পর আর কোনো যোগাযোগ নেই। অলিক কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

বীণাকে অলিকের সঙ্গে বিকেল পাঁচটায় ভাত খেতে হল। বর্ষার সময়, দিন খারাপ করছে আকাশে মেঘ জমছে অথচ অলিক তাকে ছাড়বে না। বীণা বলল, 'অলিক, আবার আসব, আজ ছেড়ে দে। বাসায় চিন্তা করবে।'

'চিন্তা করুক। অসুবিধা কি? একদিন চিন্তা করলে মানুষ মরে যায় না।'

'তুই আমাদের বাসার ব্যাপারটা জানিস না তাই এ রকম বলছিস। আমি সন্ধ্যার আগে না ফিরলে বাবার হার্ট এ্যাটাক হবে।'

'এত সহজে মানুষের হার্ট এ্যাটাক হয় না। হার্ট খুবই শক্ত জিনিস। চোখের সামনে মা মরে গেল, আমার কিচ্ছু হয় নি। আমি ইংরেজিতে কিছু কবিতা লিখেছি—আয় তোকে শোনাব।'

সন্ধ্যা মিলাল। দিন সত্যি খারাপ করেছে, গুড়-গুড় করে মেঘ ডাকছে। অলিক শক্ত করে তাকে ধরে আছে। বোঝাই যাচ্ছে এই বাঁধন ছাড়ানো সম্ভব না। সন্ধ্যা পর্যন্ত বীণার বাইরে থাকার ব্যাপারটা যে কত ভয়াবহ অলিক সেটা বুঝতেই পারছে না। এমনিতেই বাবার মেজাজ খারাপ। অফিসে কি নাকি ঝামেলা। ভাইয়া সাত দিন ধরে উধাও। কোনোরকম খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বাবার রাতে ঘুম হয় না। বারান্দায় পায়চারি করেন।

বীণা সন্ধ্যা সাতটার সময় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'তোর পায়ে পড়ি অলিক। দেখ বৃষ্টি নেমে গেছে।'

'বর্ষাকালে বৃষ্টি নামবে না? এটা আবার কেমন কথা? এই কবিতাটা শোন, আমার লাস্ট জন্মদিনে লেখা। এটা হচ্ছে সনেট। এলিজাবেথিয়ান সনেট। সনেট কী জানিস তো? চৌদ্দটা লাইন থাকে। মিল হচ্ছে abab. cdcd. efef. gg............'

বীণা ছাড়া পেল রাত আটটায়। অলিক বিরক্ত গলায় বলল, 'এরকম করছিস কেন? মনে হচ্ছে ফিট হয়ে পড়ে যাবি। যা বাড়ি যা।'

'কাউকে সঙ্গে দে ভাই, বাসায় পৌঁছে দিক।'

'কাউকে সঙ্গে দেব না। তুই একা একা যাবি। কি লজ্জার কথা, এতবড় একটা মেয়ে একা বাড়ি যেতে পারছে না। ভাবতেও লজ্জা লাগছে। যা ভাগ।'

ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একাই বীণাকে বাসায় ফিরতে হল। কেন যে গেল অলিকের কাছে? যে সব কথা সে বলতে গিয়েছিল তার কোনোটাই বলা হয় নি। তার রেজাল্টের কথাটা পর্যন্ত বলতে পারল না। এখন রাত দুপুরে একা একা ফিরতে হচ্ছে। রাস্তা অন্ধকার। রিকশাওয়ালার ভাবভঙ্গি যেন কেমন–কেমন। বার–বার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে। কোনো রিকশাওয়ালা তো এরকম করে তাকায় না। একবার সে রিকশা থামাল, বীণার বুক ধক্ করে উঠল। শুধু শুধু রিকশা থামাল কেন? কী চায় সে? বীণা এখন কী করবে? চিৎকার দেবে? রাস্তায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না! চিৎকার করলে কেউ কি শুনবে?

পৌঁছতে পৌঁছতে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। বীণা রিকশায় বসে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। পথ যেন তার ফুরাচ্ছে না।

মিজান সাহেব সন্ধ্যা থেকেই কল্যাণপুর বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটা টর্চ লাইট। মাথার উপর ছাতা ধরা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাকভেজা হয়ে গেছেন গায়ে জ্বরও আসছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। বীণা যখন রিকশা থেকে কাঁপা গলায় ডাকল, 'বাবা!' তখনো ঘোর কাটল না। বীণা বলল, 'উঠে আস বাবা।' তিনি উঠলেন না। একবার শুধু টর্চ ফেলে বীণার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরই টর্চ নিভিয়ে রিকশার পেছনে পেছনে আসতে লাগলেন।

দু'ঘন্টা হয়েছে বীণা ঘরে এসেছে। মিজান সাহেব এই দু'ঘন্টায় একটি কথাও বলেন নি। কাপড় বদলে খাওয়া–দাওয়া করেছেন। বারান্দায় জলচৌকিতে বসে দুটো সিগারেট শেষ করেছেন। সমস্ত ঘরের আবহাওয়া থমথমে। ফরিদা স্বামীর পাশে পাশে আছেন। লীনা ও বাবলু খুবই উঁচু গলায় পড়ছে। যেন তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় পড়ার বইতে। মিজান সাহেব দ্বিতীয় সিগারেটটা শেষ করলেন না, বৃষ্টির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে শীতল গলায় বললেন, 'বীণাকে আমার ঘরে পাঠাও।'

ফরিদা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'মেয়ে বড় হয়েছে, মারধোর করবে না।'

'যা করতে বলছি, কর।'

বীণা মাথা নিচু করে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কে তার মুখ নীল। মিজান সাহেব স্ত্রীকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত মিজান সাহেবের কোনো জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলেন বীণা মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার ঠোঁট কেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে। ফরিদা প্রাণপণে দরজা ধাক্কাচ্ছেন। বাবলু ও লীনা চিৎকার করে কাঁদছে। এক সময় মিজান সাহেব দরজা খুললেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই শুধু লীনা ফুঁপিয়ে–ফুঁপিয়ে বলল, 'আপা মরে গেছে। ও আম্মা, আপা মরে গেছে।'

রাত প্রায় দুটোর মতো বাজে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মিজান সাহেব ঘুমান নি। জলচৌকির উপর বসে আছেন। বারান্দায় বাতি নেভানো। তবু বারান্দা পুরোপুরি অন্ধকার হয় নি। আকাশে চাঁদ আছে। তার ক্ষীণ আলোয় সব কিছুই ম্লানভাবে নজরে আসে।

মিজান সাহেব জলচৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে তার ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াতেই বৃদ্ধা বললেন, 'কী চাসরে মিজান?'

মিজান সাহেব বললেন, 'বীণা কি ঘুমুচ্ছে?'

'হ ঘুমাইতেছে। তুই কামটা কী করলি?'

তিনি জবাব দিলেন না। বৃদ্ধা বললেন, 'তোর মাথাটা খারাপ হইছে। তুই একটা তাবিজ কবচ নে। একটা ডাক্তার দেখা। তোর মইদ্যে আমি মাথা খারাপের লক্ষণ দেখি।'

তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর খুব ঘরে ঢোকার ইচ্ছা হচ্ছিল। ঢোকা সম্ভব নয়। দরজা খুলতে হলে বীণাকে জাগাতে হবে। বীণাকে জাগাতে ইচ্ছা করছে না।

বৃদ্ধা বললেন, 'ভিতরে আয় দরজা খোলা।'

তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

বৃদ্ধা বললেন, 'এক কাম কর। মেয়ের মাথায় হাত দিয়া মনে–মনে মেয়ের কাছে মাফ চা। মাফ না চাইলে তুই মনে শান্তি পাইবি না। আর এর মধ্যে দোষের কিছু নাই।'

মিজান সাহেব এগিয়ে এসে মেয়ের পিঠে হাত রাখলেন।

' ও মিজান।'

'কি?'

'মেয়েটার বিয়া দে। তোর কাছে মেয়েটা কষ্ট পাইতেছে।'

মিজান সাহেব জবাব দিলেন না। তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। তিনি লজ্জিত বোধ করছেন। ঘর অন্ধকার নয়ত আরো বেশি লজ্জা পেতেন। অবশ্যি আলো থাকলেও তাঁর মা তাকে দেখতে পেতেন না।

'ও মিজান।'

'কি?'

'যা ঘরে যা। ঘরে গিয়ে ঘুমা।'

মিজান সাহেব বের হয়ে এলেন। তিনি অবশ্যি জানতে পারলেন না যে বীণা ঘুমায় নি। জেগেই ছিল। জানলে তাঁর কেমন লাগত কে জানে।

৩

ওসমান গনির অফিস ঘরটি ছোট। তাঁর সামনে একটি মাত্র চেয়ার। তিনি একসঙ্গে বেশি মানুষের সাথে কথা বলতে পারেন না। এক জনের সঙ্গে কথা বলেন। আজ মিজান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন—কিন্তু মিজান সাহেব এখনো এসে পৌছান নি। গনি সাহেব হাতে ঘড়ি পরেন না। তাঁর এই ঘরে কোনো ঘড়িও নেই। তবু তিনি জানেন যে এগারটার উপর বাজে।

তাঁর সেক্রেটারি মজনু মিয়া বলল, 'উনি কয়েকদিন ধরেই দেরি করে অফিসে আসছেন। পরশু এসেছেন লাঞ্চ টাইমের পরে।'

গনি সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'উনি দেরি করে আসছেন না সময়মতো আসছেন

এই খোঁজ নেবার জন্যে তো আমি তোমাকে বলি নি। বলেছি? তোমাকে বলেছি তাঁকে খবর দিতে। তুমি তাকে পাও নি। ব্যাস ফুরিয়ে গেল। ইতং বিতং এত কথা কেন? বেশি বলা ভালো না মজনু মিয়া। কথা বলবে কম। কাজ করবে বেশি বুঝতে পারলে?'

'জ্বি স্যার।'

'এখন আমার সামনে থেকে যাও। কাজ কর।'

মজনু মিয়া বিরস মুখে বের হয়ে গেল। তাকে কাজ করতে বলা হয়েছে অথচ তার হাতে কোনো কাজ নেই। কখনো ছিলও না। তার টেবিল ফাইলশূন্য।

বড় সাহেবের ফাইলপত্রে সেক্রেটারির খানিকটা অধিকার থাকে। মজনু মিয়ার কিছুই নেই। গনি সাহেব সমস্ত ফাইল নিজে দেখেন। চিঠিপত্র ড্রাফট নিজে করেন। টেলিফোনটিও তাঁর ঘরে। সেক্রেটারি হিসেবে মজনু মিয়া যে টেলিফোন প্রথমে ধরবে সেই সুযোগও নেই। মজনু মিয়া তার গদি আঁটা চেয়ারে কাত হয়ে বসে থাকে এবং ভাবে কেন অকারণে গনি সাহেব বেতন দিয়ে তাকে পুষছেন। মাঝে-মাঝে এই চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে। বাজার খারাপ। চাকরি ছেড়ে দিলে নতুন কিছু জোগাড় করা সম্ভব না। গনি সাহেব মালিক হিসেবে ভালো। দুই ঈদে বোনাসের ব্যবস্থা আছে। কনট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মচারী কল্যাণ তহবিল খুলেছেন। এক জন ডাক্তারের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। এই ডাক্তার সপ্তাহে তিনদিন আসেন এবং এক ঘন্টা থাকেন। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যে সব ওষুধ কেনা হয় তার অর্ধেক দাম কোম্পানি দেয়।

তার চেয়েও বড় কথা কোম্পানি বড় হচ্ছে। গনি সাহেব শিপিং বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছেন এ রকম কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে। অবশ্যি গনি সাহেব সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। তাঁর সম্পর্কে যা শোনা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না।

গনি সাহেব এক ঘন্টা ধরে গভীর মনোযোগে ফাইলপত্র দেখছেন। বিদেশে এলসি বিষয়ক ফাইল। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। একটা কিছু ঠিকমতো হয় নি বলে তাঁর মন বলছে, কিন্তু সেটা কী তা ধরতে পারছেন না। কর্মচারীদের কাউকে তিনি অবিশ্বাস করেন না আবার বিশ্বাসও করেন না। তাঁর কাছে সব সময় মনে হয় মানুষ এমন একটা প্রাণী যাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করা যায় না।

'স্যার আসব?'

গনি সাহেব ফাইল বন্ধ করে বললেন, 'আসুন, আসুন। বসুন। কেমন'আছেন?' মিজান সাহেব সঙ্কুচিত গলায় বললেন, 'ভালো।' তিনি ভেবেছিলেন গনি সাহেব তাঁর দেরি করে আসার ব্যাপারে কোনো কৈফিয়ত তলব করতে পারেন। আগে একদিন তাঁকে খোঁজ করে পান নি। কিন্তু গনি সাহেব কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। হাসিমুখে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন, 'আপনার ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'জ্বি না স্যার।'

'ক'দিন হল?'

'পনের দিন।'

'আগেও কি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে?'

'জ্বি না, এই প্রথম।'

'বন্ধু-বান্ধব কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? ওরা জানে কিনা?'

'জ্বি না।'

'বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা বা গয়না-টয়না কিছু নিয়েছে? সাধারণত এরা এই কাজটা করে। মোটা কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মাস খানেক ঘোরে। তারপর ফিরে আসে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'আমি চিন্তা করছি না।'

'গুড, ভেরি গুড। আর ঐ পাশ ফেল নিয়েও চিন্তা করবেন না। আজকালকার পরীক্ষা—এর পাশও যা ফেলও তা। আমি আপনার ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।

মিজান সাহেব বিস্মিত হলেন। গনি সাহেব এই জাতীয় কথা কখনও বলেন না।

গনি সাহেব বললেন, 'বুঝলেন মিজান সাহেব, আমি আসলে ফেল করা ছেলেই পছন্দ করি। ফেল করা ছেলের কোনো ক্যারিয়ার নেই। সে জানে অন্য কোথাও সে কিছু করতে পারবে না। কাজেই সে যা পায় তা নিয়েই প্রাণপণ খাটে। বুঝতে পারছেন?'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না, তবে লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা মনে-মনে করলেন, নির্বোধ চেহারার রোগা বেঁটে-খাটো এক জন মানুষ। অথচ লোকটির মাথা কাঁচের মতো পরিষ্কার।

'মিজান সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'এইটা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছিলাম। আরেকটা কথা, শুনলাম ফাইলপত্র নিয়ে প্রায়ই বাড়ি যান। ফাইলে কোনো সমস্যা আছে।'

'জ্বি না।'

'হিসেবে কিছু গরমিল?'

মিজান সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'তেমন কিছু না স্যার। সামান্য।'

'সামান্য থেকে বড় কিছু হয়। নদীতে বাঁধ দেয়া হয় জানেন তো? বাঁধ ভাঙে কী করে জানেন? প্রথমে সামান্য একটা ফাটল দেখা যায়। খুবই সামান্য। হয়ত ইঁদুর গর্ত করেছে সেই গর্ত থেকে ফাটল। বাঁধ শেষ পর্যন্ত ঐ ফাটল থেকেই ভাঙে—মিজান সাহেব।'

'জ্বি।'

'ফাইল আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি সমস্যা কি বের করে দেব।'

'আমি নিজেই পারব স্যার।'

'নিজে পারলে তো খুবই ভালো।'

'যাই স্যার।'

'আচ্ছা যান। ছেলের জন্যে চিন্তা করবেন না। এই বয়সের ছেলে এ রকম করেই। মাসখানিক যদি বাইরে বাইরে ঘোরে সেটা ভালো হবে।'

গনি সাহেব আবার ফাইল খুললেন। গোড়া থেকে দেখা শুরু করলেন। এলসিতে ঝামেলা আছে। ঝামেলাটা তিনি ধরতে পারছেন না। বাঁধ হঠাৎ করে ভাঙে না। প্রথমে ক্ষুদ্র একটা ফাটল। ইঁদুরের গর্ত কিংবা সাপের গর্ত তারপর—তিনি গর্ত খুঁজছেন।

টেলিফোন বাজছে।

কর্মীলোক টেলিফোন বাজলে খুব বিরক্ত চোখে তাকায়। গনি সাহেব কখনো

বিরক্ত হন না। যখনই ফোন আসে রিসিভার হাতে নিয়ে মধুর গলায় বলেন, 'আসসালামু আলায়কুম, কাকে চান?'

আজ বলার সুযোগ পেলেন না। ওপাশ থেকে তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আপনে একটু বাসায় আসেন।'

গনি সাহেবের স্ত্রী রাহেলা বেগম স্বামীকে আপনি করে বলেন। কথাবার্তা বলেন নেত্রকোণার উচ্চারণে। একটু টেনে-টেনে। গনি সাহেব বললেন, 'কী হয়েছে?

'বাবু যন্ত্রণা করতাছে।'

'কি যন্ত্রণা?'

'জিনিসপত্র ভাঙতাছে। বড় জামাইয়ের হাতে কামড় দিছে।'

'বড় জামাই এখানে আসল কেন?'

'আমি খবর দিছি।'

'এক জনকেই খবর দিয়েছ না তিন জনকেই খবর দিয়েছ?'

'তিন জনরেই বলছি।'

গনি সাহেব অসম্ভব বিরক্ত হলেন। বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, সহজ গলায় বললেন, 'আমি আসছি।'

রাহেলা বললেন, 'বড় জামাই আফনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'আমি তো রওনাই হচ্ছি। কথা বলার কী আছে?'

'জ্বি আচ্ছা।'

গনি সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তাঁর ছেলেমেয়ে চার জন। তিন মেয়ের পর এক ছেলে—বাবু। বাবুর বয়স এগার। বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, জড় পদার্থের মতো। অথচ মেয়ে তিনটি অসম্ভব ধুরন্ধর। বিয়েও হয়েছে তিন ধুরন্ধরের সঙ্গে। গনি সাহেবের ধারণা, তাঁর তিন কন্যা এবং তিন জামাতা কবে সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা হবে সেই দিন গুনছে।

তিনি জাহাজ কিনছেন খবর শুনে তিন জামাই একসঙ্গে এসে উপস্থিত। বিনয়ে একেকজন প্রায় মাখনের মতো গলে যাচ্ছে। তাদের তিন জনেরই বক্তব্য হচ্ছে—জাহাজ কিনলে বিরাট লোকসান হবার সম্ভাবনা। এক্সপেরিয়েন্সড লোক ছাড়া এইসব কেউ সামাল দিতে পারে না।

গনি সাহেব তাদের দীর্ঘ কথাবার্তা মন দিয়ে শোনার পর বললেন, 'জাহাজ কিনলে লোকসান হবে?'

'জ্বি, বিদেশি ক্রু রাখতে হবে। এদের বেতন দিতেই অবস্থা কাহিল। টোটাল লস হবে।'

'টোটাল লসটা কার হবে? আমার তো?'

জামাইরা চুপ করে রইল। তিনি বললেন, 'আমার লসের ব্যাপারে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন?'

জামাইরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তিনি বললেন, 'কথাটা মনে থাকে যেন।'

জামাইদের এই কথা মনে থাকে না। শ্বশুরের ইনকামট্যাক্স কত দেয়া হল তারা এই খবর বের করতে চেষ্টা করে। সাভারের পঞ্চাশ বিঘা জমিতে ইন্ডাস্ট্রি হবে, না

জমি এমনি পড়ে থাকবে এই নিয়ে তাদের চিন্তার শেষ নেই।

রাহেলা বেগম তাঁর জামাইদের খুবই পছন্দ করেন। উঁচু গলায় সব সময় বলেন, 'জামাইরা যে মায়া মহব্বত তাঁকে দেখায় তার ভগ্নাংশও নিজের মেয়েরা তাঁকে দেখায় না।' কথা মিথ্যা না।

তিনটি অতিরিক্ত বুদ্ধিমতী মেয়ের পর এ রকম জড় বুদ্ধির ছেলে তাঁর কী করে হল এই নিয়ে গনি সাহেব মাঝে-মাঝে চিন্তা করেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই বিষয় সম্পত্তির একটা শক্ত ব্যবস্থা তিনি করে যেতে চান। অবশ্যি সবাই বাবুকে যতটা জড়বুদ্ধি ভাবে ততটা সে নয় বলেই গনি সাহেবের ধারণা। যা আছে তা বয়সের সঙ্গে কেটে যাবে বলেও তিনি মনে করেন।

গনি সাহেব বাসায় ফিরে দেখলেন গ্লাস ও কাপের ভাঙা টুকরো বাড়িময় ছড়ানো। বাবু পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে। চোখ রক্ত বর্ণ। অনেকখানি দূরে, শাশুড়ির সঙ্গে তিন জামাই দাঁড়িয়ে আছে। বড় জামাইয়ের বাঁ হাতে রুমাল বাঁধা। সে শ্বশুরকে দেখেই এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, 'খুবই ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে। আমার মনে হয় সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া দরকার। ডাক্তার এফ জামানকে কল দিয়েছি, উনি এসে পড়বেন। এফ জামান নামকরা নিউরোলজিস্ট—আমার খুব চেনা জানা।'

গনি সাহেব বড় জামাইকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাবুর দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'বাবু, কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নাই।'

'গ্লাস ভেঙেছ কেন?'

'ওরা শুধু আমাকে বিরক্ত করে।'

'কি করে?'

'ঠাণ্ডা পানি চেয়েছিলাম দেয় নাই।'

'তুমি নিজে ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা পানি নিলে না কেন? বোতল তো পানি ভর্তি থাকে। যাও ফ্রিজ থেকে পানি নিয়ে খাও।'

বাবু শান্ত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলল। গনি সাহেব অফিসে ফিরে গেলেন। এল-সি'র ফাইল ভালোমতো দেখতে হবে। একটা ঝামেলা আছে। সূক্ষ্ম একটা ফাঁক। সেই ফাঁকটা কী? বের করতে হবে। বসতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়।

৪

সপ্তাহে একদিন মিজান সাহেব লীনা ও বাবলুকে নিয়ে পড়াতে বসেন। দিনটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার। গত সপ্তাহে তিনি পড়ানোর কাজটি করেন নি। বাবলুর মনে ক্ষীণ আশা—হয়ত আজও পড়াবেন না। বাসার পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। ভাইয়া এখনো ফেরে নি। তার কোনোরকম খোঁজও নেই। বড় আপা ঐ রাতের ঘটনার পর কারো সঙ্গে কথা বলছে না। মার শরীরও খুব খারাপ। এখন বেশিরভাগ সময় বিছানাতেই থাকেন। এ রকম একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে বাবা নিশ্চয়ই বই নিয়ে পড়াতে

বসবেন না। তবু বাবলুর বুক ধক-ধক করছে। সন্ধ্যা মিলানোর আগেই হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসে গেছে। পড়ছে খুব উঁচু গলায়, যাতে বাবা ধারণা করে নেন পড়াশোনা তো ভালোই হচ্ছে।

বাবলু এবার ক্লাস সেভেনে উঠেছে। তার রোল নাম্বার চার। ধর্ম পরীক্ষায় সে একশতে মাত্র চল্লিশ পেয়েছে বলে এই অবস্থা হয়েছে। ধর্ম স্যার কেন জানি বাবলুকে দেখতে পারেন না। ধর্ম মৌখিক পরীক্ষায় তাকে পঁচিশের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিয়েছেন অথচ সে ধর্মের পাঁচটি ভিত কী বলেছে, এশার নামাজের নিয়ত বলেছে, কুলহুআল্লা সুরা বলেছে, চার সাহাবাদের নাম বলেছে। শুধু নবী কত বৎসর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন এটা বলতে পারে নি। দুঃখের ব্যাপার হল এটা বলতে না পারার জন্যে স্যার তাকে একটা চড় মারলেন। পরীক্ষার সময় কেউ কিছু না পারলে কি চড় মারা ঠিক? বাবলু অনেক ভেবেও বের করতে পারে নি কেন ধর্ম স্যার তাকে দেখতে পারেন না। তার অপরাধটা কী? সে তো ক্লাসে কোনো গণ্ডগোল করে না। হৈ-চৈ করে না বা হেড স্যারকে অন্যদের মতো হেড়ু বলে না।

বাবলুর ধারণা বাবাও তাকে দেখতে পারেন না। বৃহস্পতিবারে পড়তে বসা মানেই মার খাওয়া। অথচ সে সব প্রশ্নের উত্তর জানে। সে যদি না জেনে মার খেত তাহলেও একটা কথা ছিল। বাবলু ঠিক করে রেখেছে আর একটু বড় হলেই সে ভাইয়ার মতো পালিয়ে যাবে।

বাবলুর সামনে লীনা বসে আছে। তার মুখও ফ্যাকাশে। সে একটু পর পর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। ঘড়িতে কোনোক্রমে আটটা বেজে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আটটার পর বাবা আর পড়াতে বসেন না।

লীনা এ বছর ক্লাস টেনে উঠেছে। পড়াশোনায় সেও ভালো। যদিও পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না। পরীক্ষার হলে বসলেই তার হাত কাঁপে। যে জিনিসটা জানা আছে তাও লিখতে পারে না। লীনা ফিস ফিস করে বলল, 'বাবা বোধ হয় আজ পড়াবে না। তাই নারে বাবলু? আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

বাবলুর মুখে আনন্দের একটা আভা খেলে গেল। ঠিক তখন মিজান সাহেব ডাকলেন, 'লীনা।' লীনার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'জ্বি।'

'বীণাকে বল আমাকে এক কাপ আদা চা দিতে।'

লীনার মুখে রক্ত ফিরে এল। এটা খুবই ভালো লক্ষণ। বাবা চা খাবেন—চা খেতে-খেতে আটটা বেজে যাবে। খবরের টাইম হয়ে যাবে। তিনি আধা ঘন্টা খবর শুনবেন তারপর ভাত খাবার সময় হয়ে যাবে। লীনা বীণাকে চায়ের কথা বলতে গেল। যাবার আগে বাবলুর দিকে তাকিয়ে আনন্দের হাসি হাসল।

এমনিতেই বাবার সঙ্গে বীণার তেমন কথাবার্তা হয় না। ঐ রাতের ঘটনার পর কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ। শুধু কথাবার্তা না, বীণা বাবার দিকে মুখ তুলে তাকায়ও না। মিজান সাহেব যতক্ষণ বাসায় থাকেন ততক্ষণ বীণা হয় তার নিজের ঘরে কিংবা রান্নাঘরে থাকে।

অন্ধকার বারান্দায় মিজান সাহেব চুপ করে বসে আছেন। বীণা বাবার পাশে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। মিজান সাহেব দেখলেন বীণার হাতে ঘড়ি নেই। কয়েকদিন ধরেই তিনি ব্যাপারটা লক্ষ করছেন। বীণা তার বাবার দেয়া ঘড়ি পরছে না। একবার জিজ্ঞেস

করা যায় না—'কেন?'

মিজান সাহেব চা শেষ করে শীতল গলায় বললেন, 'লীনা বাবলু বই নিয়ে আয়।'

বীণা মার জন্যে সাগু বানাচ্ছিল। বাবলু পাংশু মুখে পাশে এসে দাঁড়াল। ফিস ফিস করে বলল, 'আপা, বাবা আমাকে মারবে।'

'মারবে কেন?'

'অঙ্ক বই হারিয়ে ফেলেছি আপা।'

'আজ অন্য পড়া পড়। অঙ্ক না করলি।'

'যদি অঙ্ক করতে বলে?'

বীণা উত্তরে কিছু বলতে পারল না। বারান্দা থেকে মিজান সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'বাবলু রান্নাঘরে তুই কী করছিস? এদিকে আয়।'

বাবলু অঙ্ক বই হারিয়ে ফেলেছে এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ল। শুধু অঙ্ক বই না, সে জ্যামিতি বাক্সও হারিয়ে ফেলেছে। জ্যামিতি বাক্স হারিয়েছে দশ দিন আগে। বাবলু ভয়ে কাউকে কিছু বলে নি।

মিজান সাহেব বাবলুকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। ফরিদাকে বললেন, 'তুমি একটু বাইরে যাও। কোনো কথা বলবে না। বাইরে যেতে বলছি বাইরে যাও।' ফরিদা শুকনো মুখে বের হয়ে এলেন। মিজান সাহেব দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিলেন। কঠিন শাসনের সময় তিনি সাধারণত বাতি নিভিয়ে দেন।

রান্নাঘরের কাজ ফেলে বীণা বন্ধ দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফরিদা জলচৌকিতে বসে আছেন। লীনা এখনো চোখের সামনে বই ধরে আছে। তার মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সে অল্প অল্প কাঁপছে। তার ইচ্ছা করছে দৌড়ে দাদীর কাছে চলে যেতে। আবার কেন জানি সে সাহসও হচ্ছে না। দাদীকেও সে খানিকটা ভয় করে।

মার শুরু হয়েছে।

রাগে অন্ধ হয়ে মার।

বাবলু গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'তুমি আমার একটা কথা শোন বাবা। তুমি আমার একটা কথা শুধু শোন।'

'কী কথা?'

'আমি আর বই হারাব না।'

'কথা শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

মার আবার শুরু হল। বাবলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কোনোদিন বই হারাব না বাবা। কোনোদিন বই হারাব না।'

'চুপ।'

'বাবা, আমার একটা কথা শুধু শোন। একটা মাত্র কথা।'

'চুপ।'

কিছুক্ষণ মারের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। তারপর শোনা গেল বাবলুক্ষীণ স্বরে ডাকছে—'আপা, ও আপা, ও বড় আপা।'

বীণা বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের ঘর থেকে বীণার দাদী চিৎকার করছেন, 'বিষয় কি? বিষয়ডা কি? ও হারামজাদার দল বিষয়ডা কি?'

কেউ তাঁর কোনো জবাব দিচ্ছে না।

বাবলু রাতে কিছুই খেতে পারল না। তার সমস্ত গা ফুলে উঠেছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। বীণা এক গ্লাস গরম দুধ এনে দিয়েছিল, খানিকটা খেয়েই বমি করে ফেলল। রাত দশটার দিকে মিজান সাহেব এক জন ডাক্তার ডেকে আনলেন। হতভম্ব ডাক্তার বললেন, 'এরকম হল কীভাবে?'

মিজান সাহেব বললেন, 'আমি মেরেছি। হাড় গোড় ভেঙেছে কিনা এইটা আপনি দেখুন।'

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বাবলুকে যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যথা লাগছে খোকা?'

বাবলু বলল, 'জ্বি না।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'এত মেরেছেন কেন? ছেলে কী করেছে?'

মিজান সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'কী জন্যে মেরেছি তা দিয়ে তো আপনার দরকার নেই ভাই। চিকিৎসা করতে এসেছেন চিকিৎসা করে চলে যাবেন।'

মিজান সাহেব ভিজিটের টাকা বের করলেন।

বীণা রাতে কিছু খায় নি। কুয়ার পাশে একা একা বসে আছে। ফরিদাও খান নি। তিনি দু'জনের জন্যে ভাত বেড়ে কুয়ার পাড়ে মেয়েকে ডাকতে এলেন।

'ভাত খাবি আয়রে বীণা।'

'ভাত খাব না মা।'

'কেন খাবি না?'

'ইচ্ছে করছে না। তাই খাব না।'

'তোর বাবার উপর রাগ করেছিস?'

'না। বাবার উপর আমি রাগ করি নি মা। রাগ করেছি তোমার ওপর। কেন তুমি বাবাকে আটকাও না? কেন এই সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক?'

ফরিদা ক্ষীণ স্বরে কী বললেন কিছু বোঝা গেল না। বীণা বলল, 'আমাকে সাধাসাধি করে কিছু হবে না মা। আমি ভাত খাব না। তুমি বরং বাবলুর কাছে যাও। বাবলুকে একটু আদর টাদর কর।'

'বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'ঘুমিয়ে পড়লে তো ভালোই। তুমিও খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

'তুই এখানে বসে থাকবি নাকি?'

'না আমিও ঘুমুব। এখানে শুধু শুধু বসে থাকব কেন?'

ফরিদা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

বাবলু ঘুমায় নি। সে এবং লীনা এক খাটে ঘুমায়। অন্য খাটে বুলু। বুলু নেই বলে দু'জন দু'খাটে ঘুমুচ্ছে। আজ লীনা শুয়েছে বাবলুর সঙ্গে। তারা দুই ভাইবোন প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে। নিচু গলায় গল্প। সেই সব গল্পের কোনো আগা নেই মাথা নেই। আজও দু'জন গল্প করছে। বেশিরভাগ কথা লীনাই বলছে। বাবলু 'হ্যাঁ হুঁ' দিয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে লীনা হঠাৎ বলল, 'বেশি ব্যথা পেয়েছিলি বাবলু?'

বাবলু বলল, 'হ্যাঁ।' লীনার সঙ্গে নিশিরাতের কথা বার্তায় সে কখনো মিথ্যা বলে

না।

বীণা অনেক রাতে ঘুমুতে গেল।

দাদী তখনো জেগে। বীণার পায়ের শব্দ শুনেই বললেন, 'তোর বাবার মাথায় কী হইছে রে বীণা? আইজ আবার মারল? এরা হইল পাগলের বংশ বুঝলি। আমার শ্বশুরের বাপ ছিল পাগল। বদ্ধ পাগল। হেই বংশের ধারা। রক্ত বড় কঠিন জিনিস। মানুষ মইরা যায় রক্ত থাকে। বাপের কাছ থাইক্যা পায় পুলা। পুলার কাছ থাইক্যা তার পুলা। তার পুলার কাছ থাইক্যা তার পুলা। তার পুলার কাছ থাইক্যা............'

'চুপ কর দাদী।'

'তুই চুপ কর হারামজাদী। তুই মর।'

বীণা কথা বাড়ায় না। শুয়ে পড়ে। অসহ্য গরমে তার ঘুম আসে না। জেগে জেগে শুনে বারান্দায় বাবা হাঁটাহাঁটি করছেন। এ মাথা থেকে ও মাথায় যাচ্ছেন। আবার ফিরে আসছে। বীণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

গরম লাগছে। গা ঘেমে যাচ্ছে। ইস্ একটা ফ্যান যদি এ ঘরে থাকত।

৫

অলিকের ক্লাস ছিল এগারটায়—পোয়েট্রি ক্লাস। আজ পড়ানো হবে টেড হিউজের থট ফক্স। রাতের বেলা সে একবার পড়ল। পড়ে মনে হল—বাহ বেশ তো। সুন্দর কবিতা।

'Till with a sudden hot stink of fox
It enters the dark hole of the head.
The window is starless still: the clock ticks.
The page is printed.

'এর বাংলা কী হবে? কবির মাথায় হঠাৎ কবিতার একটা বোধ ঢুকে পড়ল। কি অদ্ভুত ভাবেই না বোধটা এল। যেন—'বোধ' হচ্ছে নিশাচর এক শেয়াল। যে শেয়াল তার গায়ের তীব্র গন্ধ নিয়ে অন্ধকার গর্তে ঢুকে পড়ে।

কবিতার বোধ জাতীয় ব্যাপারগুলো সাধারণত স্বর্গীয় বলে মনে করা হয়, কিন্তু এই কবি কী অদ্ভুত উপমাই না দিলেন। শেয়ালের গায়ের তীক্ষ্ণ গন্ধের কথা বললেন। আসলেই কি শেয়ালের গায়ে কোনো গন্ধ আছে, না, এটাও কবির কল্পনা?

ময়নার মা চা নিয়ে এসেছে। সে ভয়ে ভয়ে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আইজ ইউনিভার্সিটিতে যাইবেন আফা?'

'হ্যাঁ যাব। আচ্ছা ময়নার মা, তুমি শেয়াল দেখেছ?'

ময়নার মা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'শেয়াল দেখ নি?'

'দেখছি আফা।'

'শেয়ালের গায়ে কি গন্ধ আছে?'

'ক্যামনে কই আফা'

'ঠিক আছে তুমি যাও।'

অলিকের মন খারাপ হয়ে গেল। তার একুশ বছর বয়স। অথচ সে শেয়াল দেখে নি। চিড়িয়াখানায় কি শেয়াল আছে? থাকলে একবার দেখে আসা যেত। চিড়িয়াখানায় টেলিফোন করে দেখবে নাকি? অলিক চায়ের পেয়ালা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হতেই বোরহান সাহেবের মুখোমুখি হয়ে গেল।

অলিকের বাবা বোরহান সাহেব ইদানীং মাথায় কলপ দিচ্ছেন। মাথার চুল হঠাৎ সব চকচকে কালো হয়ে যাওয়ায় তাঁর বয়স অনেকখানি কম মনে হয়। কম বয়েসী একটা ভাব তাঁর চলা ফেরায়ও চলে এসেছে। এখন তাঁর গায়ে নীল রঙের একটা হাওয়াই শার্ট। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'মাই ডিয়ার মাদার, তুমি কেমন আছ?'

'ভালো আছি। তুমি যুবক সেজে কোথায় যাচ্ছ বাবা?'

বোরহান সাহেব লজ্জা পেয়ে গেলেন। অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'শার্টটা কি বেশি ছেলেমানুষী হয়ে গেল?'

'কিছুটা হয়েছে।'

'আগলি দেখাচ্ছে?'

'হুঁ।'

'বলিস কী—আমার কাছে তো মনে হচ্ছে সোবার কালার। আটচল্লিশ বছর বয়সে এই কালার পরা যায়।'

'আটচল্লিশ না বাবা পঞ্চাশ।'

'ও সরি। ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে আটচল্লিশ। কাগজপত্রের বয়সটাকেই কেন জানি সব সময় সত্যি বয়স মনে হয়।'

অলিক বাবার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হালকা গলায় বলল 'বয়স কমানোর দিকে তুমি হঠাৎ এমন মন দিলে কেন? তোমার কি অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে?'

বোরহান সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের তুখোড় সচিবদের এক জন। যে কোনো জটিল পরিস্থিতি তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সামলে নিতে পারেন। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত কিছু-কিছু গল্প সচিবালয়ে প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। সেই গল্পের একটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়কার।

সচিবদের বৈঠক বসেছে। প্রেসিডেন্ট এসে ঢুকলেন এবং চুরুট হাতে বোরহান সাহেবকে দেখে শীতল গলায় বললেন, 'চুরুট ফেলে দিন।'

বোরহান সাহেব সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'কেন স্যার?'

'চুরুটের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না।'

'একসঙ্গে কাজ করতে হলে অনেক কিছু সহ্য করতে হয় স্যার। আপনি যেমন আমাদের অনেক কিছু সহ্য করতে পারেন না আমরাও আপনার অনেক কিছু সহ্য করতে পারি না। তবু চুপ করে থাকি।'

'আমার কোন্ জিনিসটি আপনারা সহ্য করতে পারেন না?'

'ঘরের ভেতরে মিটিং চলার সময়ও আপনি সানগ্লাস পরে থাকেন এইটি।'

জিয়াউর রহমান সাহেব সানগ্লাস খুলে টেবিলে রাখলেন। বোরহান সাহেব তার চুরুট ফেলে দিলেন। মিটিং শুরু হল।

বোরহান সাহেব মানুষটা স্মার্ট। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত স্মার্ট। তবু নিজের মেয়ের কাছে মাঝে-মাঝেই তিনি অসহায় বোধ করেন। এই মুহূর্তে করছেন। অলিক জানতে চাচ্ছে—'তোমার কি অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে?'

তাঁর উচিত খুব সহজভাবে এর উত্তর দেয়া। কিন্তু তিনি দিতে পারছেন না। প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব না—অলিকের সঙ্গে লুকোচুরি চলবে না। তিনি খুব ভালো করেই জানেন তাঁর এই পাগলা ধরনের মেয়েটি তাঁর মতোই স্মার্ট।

বোরহান সাহেব প্রাণহীন গলায় বললেন, 'পরে তোমার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলব।'

'ঠিক আছে।'

'আজ রাতেই কথা বলা যাবে।'

'ওকে।'

'ফাদার এন্ড ডটার, ক্লোজ ডোর টক।'

'তুমি এত নার্ভাস হচ্ছ কেন বাবা? তুমি কী বলবে আমি জানি। তুমি চাইলে এখনো কথা বলতে পার। আমার হাতে সময় আছে। আমার ক্লাস এগারটায়। মনে হচ্ছে এই ক্লাসটা করব না।'

'ক্লাস না করে কী করবে? ঘরে বসে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'সারাদিন ঘরে বসে কী কর?'

'কিছু করি না।'

'তোমার কি বন্ধু-বান্ধব নেই?'

'এক জন আছে।'

'মাঝে-মাঝে ওর সঙ্গে গল্প-টল্প করতে পার না?'

'আমি ওর ঠিকানা জানি না বাবা।'

'সে কী!'

'জানি না বলাটা ঠিক হচ্ছে না। এক সময় জানতাম। ওদের বাসায়ও একদিন গিয়েছিলাম। ওর দাদী আমাকে বলল, মর হারামজাদী।'

'কি সব পাগলের মতো কথা বার্তা।'

'ঠিক বলেছ বাবা। মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

বোরহান সাহেব বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মেয়ের প্রতি যথেষ্ট সময় দেয়া হচ্ছে না, আরো সময় দেয়া দরকার। প্রচুর সময়। মেয়েকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে গেলে কেমন হয়? ছুটি কি পাওয়া যাবে?

টেলিফোনের শব্দে অলিকের ঘুম ভাঙল। টেলিফোন করেছেন বড় মামীর মেয়ে শিপ্রা। শিপ্রাকে অলিক পছন্দ করে না আবার করেও। অর্থাৎ শিপ্রার কিছু কিছু ব্যাপার তার ভালো লাগে তার মধ্যে একটা হচ্ছে নতুন কিছু করা। এমন কিছু যা আগে কোনো মেয়ে করে নি। মুশকিল হচ্ছে এ রকম নতুন কিছু সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। শালবনে রাত জেগে জ্যোৎস্না দেখা বা নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে ছেলে সেজে ঢাকা থেকে গাড়ি করে টঙ্গি যাওয়া তেমন নতুন কিছু না।

'হ্যালো অলিক কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'ঘুমুচ্ছিস নাকি?'

'হ্যা ঘুমাচ্ছি। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কথা বলছি।'

'ভ্যাট ফাজিল—একটা একসাইটিং ব্যাপার হয়েছে। এক জন ভবঘুরের সঙ্গে পরিচয় হল।'

'কার সঙ্গে পরিচয়।'

'ভবঘুরে। তোদের ইংরেজি সাহিত্যে যাকে বলা হয় ভ্যাগাবন্ড। চলে আয়, তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। এখন বাসায় বসে আছে। এই মুহূর্তে দাড়ি চুলকাচ্ছে। ব্যাটার আবার রবীন্দ্রনাথের মতো লম্বা দাড়ি।'

'ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে পরিচয় করবার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ বোধ করছি না শিপ্রা।'

'তুই যা ভাবছিস তা না কিন্তু। ইংরেজ ভ্যাগাবন্ড।'

'ভ্যাগাবন্ড হচ্ছে ভ্যাগাবন্ড, সে ইংরেজই হোক আর বাঙালিই হোক।'

'অলিক, তুই বুঝতে পারছিস না, এই ব্যাটা দস্তয়োভস্কির উপন্যাস থেকে উঠে আসা চরিত্র।'

'দস্তয়োভস্কির কোনো উপন্যাস তো তুই পড়িস নি—জানলি কী করে উপন্যাসের চরিত্রগুলি কেমন?'

'তোর সঙ্গে বক-বক করতে ভালো লাগছে না। আমি ব্যাটাকে নিয়ে আসছি। ব্যাটার চোখের দিকে তাকালে তুই পাগল হয়ে যাবি—sky blue. রওনা হচ্ছি কিন্তু।'

অনেক রাতে বোরহান সাহেব মেয়ের ঘরে ঢুকে হাসি মুখে বললেন—'কোন এক বিদেশি নাকি এসেছিল?'

অলিক বলল, 'হ্যাঁ।'

'অনেক গল্প-টল্প করল?'

'হ্যাঁ। খুব বক-বক করতে পারে। সারা পৃথিবী ঘুরছে। আন্টার্কটিকায়ও নাকি গিয়েছিল।'

'বলিস কি?'

'হ্যাঁ সত্যি। ছবি দেখাল। পেঙ্গুইন কোলে নিয়ে ছবি—তার ধারণা পৃথিবীর সবচে সুন্দর দেশ হচ্ছে আন্টার্কটিকা।'

'সুন্দরের কী আছে? সব তো বরফে ঢাকা।'

'এই জন্যেই নাকি সুন্দর। ওখানে গেলেই নাকি পবিত্র ভাব হয়। আমি ঠিক করেছি একবার আন্টার্কটিকা যাব।'

'বেশ তো যাবি।'

'আন্টার্কটিকা যেতে কি ভিসা লাগে বাবা?'

'লাগার তো কথা না। আমি যতদূর জানি ঐটি একমাত্র মহাদেশ যেখানে পৃথিবীর সব দেশের মানুষদের অধিকার আছে।'

'বাহ খুব একসাইটিং তো।'

বোরহান সাহেব হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই একা যাবি, নাকি ঐ ইংরেজকে নিয়ে যাবি?'

'ওকে সঙ্গে নেব কেন? ও এক জন বাজে ধরনের লোক।'

'একটু আগে তো অন্যরকম বললি।'

'মোটেও অন্যরকম বলি নি। ঐ লোকটা ফস করে আমার হাত ধরল।'

'ওদের মধ্যে মেয়েদের হাত ধরা তেমন দোষণীয় কিছু না।'

'তা জানি বাবা। কিন্তু শিপ্রা যখন আমাদের ছবি তুলতে গেল তখন সে আমার কোমড় জড়িয়ে ধরে দাঁড়াতে গেল। আমি দিলাম এক ধমক।'

বোরহান সাহেব চুপ করে গেলেন। অলিক বলল, 'চমৎকার ইংরেজিতে আমি তাকে বললাম—কোনো সাদা চামড়ার লোক আমাকে জড়িয়ে ধরে, এটা আমার পছন্দ নয়। আমার গা ঘিন ঘিন করে। তুমি কালো হলে একটা কথা হত।'

'সত্যি বললি?'

'হ্যাঁ বললাম। ব্যাটার মুখটা দেখতে দেখতে ছোট হয়ে গেল। সবচে রাগ করল শিপ্রা। সে বলল, 'এইভাবে এক জনকে অপমান করার নাকি আমার কোনো রাইট নেই। বাবা আমার কি রাইট আছে?'

'অবশ্যই আছে।''

বোরহান সাহেব রাত একটা পর্যন্ত মেয়ের সঙ্গে গল্প করলেন। যে কথাগুলো বলতে এসেছিলেন সেগুলো বলতে পারলেন না। কথাগুলো তেমন জরুরি নয়। It can wait.

বাবা চলে যাবার পরও অলিক জেগে রইল। প্রতি সপ্তাহে একটি করে কবিতা মুখস্থ করার কথা। দু'সপ্তাহ বাদ গেছে। মুখস্থ করার মতো তেমন কোনো কবিতা পাওয়া যাচ্ছে না। কোনোটাই ভালো লাগছে না।

ঘুমুতে যাবার ঠিক আগে আগে অলিক আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার গায়ে নীল রঙের সুতির নাইটি। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাইটির ফিতা খুলে নিজের অনাবৃত দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের পাঁজরের নিচে এবং নাভীর ডান পাশের চামড়া কেমন বিবর্ণ হয়ে ফুলে আছে। মার অসুখের প্রথম অবস্থায় ঠিক এই রকম হয়েছিল।

অলিকের শরীরটা বড় সুন্দর। অলিক নিজেই মুগ্ধ চোখে নিজেকে দেখেছে। এখনো দেখছে। তার দৃষ্টি বার বার ফিরে যাচ্ছে দাগ দু'টির দিকে।

এই দাগ দু'টিকে সে কী বলবে? চাঁদের কলঙ্ক? না—কলঙ্ক না। চাঁদের কলঙ্ক স্থির থাকে, এরা স্থির থাকবে না। বাড়তে থাকবে। বাড়তে বাড়তে—থাক ঐ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছে না। সুন্দর কিছু নিয়ে ভাবা যাক। শ্বেত শুভ্র আন্টার্কটিকা, নির্মল পবিত্র। কিংবা টেড হিউজের থট ফক্স। Till with a sudden sharp hot stink of Fox.

বাংলা অনুবাদ করা যায় না? কেন যাবে না? চেষ্টা করলেই হবে—

''জানালার ও পাশে ছিল নিস্তব্ধ আকাশ।
চারদিকে আদিগন্ত ধূসর প্রান্তর।
সময় দাঁড়িয়ে ছিল এক পায়ে, ফেলছিল ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস।

মস্তিষ্কের লক্ষ নিওরোনে—গাঢ় অন্ধকার।
হঠাৎ উড়ে এল বোধ।
অলৌকিক স্বপ্নময় বোধ।
কবির লেখার খাতায়—গান, সুর ও স্বর।''

ব্যাপারটা কেমন হল? শেয়াল বাদ পড়ে গেল না? কোথাও একটা লাইন ঢুকানো দরকার ছিল, যেখানে ঝাঁঝাল গন্ধের নিশাচর শেয়াল গর্তে ঢুকবে।

অলিক বিছানায় শুয়ে বাতি নেভানো মাত্র বৃষ্টি শুরু হল। চমৎকার কাকতালীয় ব্যাপার। বৃষ্টিটা পাঁচ মিনিট আগে বা পরেও শুরু হতে পারত। তা হল না। বাতি নেভানো এবং বৃষ্টির শুরুটা হল একই সঙ্গে।

এ রকম কাকতালীয় ব্যাপার মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই খুব বেশি আসে না।

কিংবা কে জানে হয়ত খুব বেশিই আসে, কেউ কখনো লক্ষ করে না। মানুষ কখনো কিছু লক্ষ করে না। তার চোখের সামনে কত কিছু ঘটে সে তাকিয়ে থাকে কিন্তু দেখে না। মানুষের দেখতে না পারার ক্ষমতা অসাধারণ।

অলিকের এখন একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে। তবে চিঠিটা লেখা হবে অন্ধকারে। মুশকিল হচ্ছে অন্ধকারে চিঠি লেখার কোনো উপায় নেই। থাকলে ভালো হত।

চিঠি কাকে লেখা যায়? কবি কিটসকে লিখলে কেমন হয়? মৃত মানুষদের কাছে চিঠিপত্র লেখার আলাদা আনন্দ আছে। চিঠির উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।

৬

এটা কে?

বুলু না?

মাথা নিচু করে চা খাচ্ছে। গায়ে চেক হাওয়াই শার্ট। হাতে একটা সিগারেটও আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। পেছনটা দেখা যাচ্ছে। মিজান সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। কল্যাণপুর বাস ডিপোর সঙ্গের রেস্টুরেন্ট। বখা ছেলেদের আড্ডা। এদের মধ্যে এক জন আছে—অতি বদ। স্কুল ড্রেস পরা কোনো মেয়ে দেখলেই—কিছু না কিছু বলবে। কদর্য কিছু কথা যার সঙ্গে রসিকতা মেশানো। কথা শেষ হওয়া মাত্র রেস্টুরেন্টের সবাই একসঙ্গে হেসে উঠবে।

বুলু এই দলের মধ্যে বসে আছে? ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। বুলু তেমন ছেলে না। তবে কোনো বাবা-মা নিজের ছেলেমেয়েদের খুব বেশি চেনেন না। মিজান সাহেবও হয়ত চেনেন না। একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত তাদের চেনা যায়, তারপর আর যায় না।

মিজান সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। বুলুর হাতের সিগারেটটা শেষ হোক। বুলু সিগারেট ধরেছে এটা অবশ্যি খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু মিজান সাহেব কেন জানি তেমন দুঃখিত বোধ করলেন না। এর কারণ কি কে জানে। হয়ত তাঁর মনে ভয় ছিল বুলুকে পাওয়া যাবে না। অবশ্যি এমন কিছু সচেতন ভাবে তিনি ভাবেন নি, তবে

অবচেতন মন বলে একটা ব্যাপার আছে। যেই মন গোপনে অনেক কিছুই ভাবে।

বুলুকে তিনি কি বলবেন? আদরের ভঙ্গিতে বলবেন, চল বাসায় চল। নাকি ঠাণ্ডা গলায় বলবেন, বাসায় যা। তিনি নিজেও কি বুলুর সঙ্গে বাড়ি ফিরবেন, না বুলুকে ফেরার কথা বলে সহজ ভঙ্গিতে অফিসের দিকে রওনা হবেন। যেন এক মাস পর ছেলের দেখা পাওয়া তেমন কোনো ঘটনা না। কিংবা তেমন কোনো ঘটনা হলেও একে গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই।

বুলু সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াতেই মিজান সাহেব চমকে উঠলেন—এ বুলু নয়। চোয়াড়ে ধরনের একটা ছেলে। চেহারায় বুলুর সঙ্গে কোনো মিল নেই অথচ তিনি এতক্ষণ ধরে তাকে বুলু ভাবছেন—এর কারণ কি? গায়ের শার্টটাই কি কারণ? বুলুরও এই রকম একটা শার্ট আছে। খয়েরি রঙের শার্ট।

মিজান সাহেব বাসে উঠে পড়লেন। তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। খয়েরি রঙের চেক শার্ট পরা ছেলে এই শহরে নিশ্চয়ই অনেক আছে। তাদের সবাইকে কি তিনি এখন থেকে বুলু বলে ভুল করবেন? তিনি জানালার পাশে একটা সিট পেয়েছেন। বাসে জানালার পাশে বসলে আপনাতেই মনটা ভালো হয়। আজ হচ্ছে না।

অফিসে ঢুকবার মুখে বেয়ারা অজিত বলল, 'স্যার আফনের ছেলে ফিরছে?'

মিজান সাহেব জবাব দিলেন না। এই এক যন্ত্রণা হয়েছে। অফিসে আসামাত্র সবাই একবার জিজ্ঞেস করবে—ছেলে ফিরেছে কিনা। বুলু ফিরেছে কি ফেরে নি এই নিয়ে কারো কোনো আগ্রহ নেই। অথচ সবাই জিজ্ঞেস করে। এটা যেন একটা রুটিন কাজ। 'আপনি ভালো আছেন?' এর মতো একটা বাক্য। প্রশ্নকর্তা অভ্যাসের মতো জিজ্ঞেস করেন। ভালো থাকলেও প্রশ্নকর্তার কিছু যায় আসে না, ভালো না থাকলেও না।

নিজের ঘরে ঢোকার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পাশের কামরার করিম সাহেব চায়ের কাপ হাতে চলে এলেন—চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'কোনো খবর পাওয়া গেল?'

বেয়ারা শ্রেণীর কারোর প্রশ্নের জবাব না দিলে চলে কিন্তু সহকর্মীদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। মিজান সাহেব বললেন, 'না।'

'বলেন কি? এক মাসের মতো হয়ে গেল না?'

'জ্বি।'

'আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এদের কাছে খোঁজ করেছেন?'

'না।'

'করা দরকার, তারপর থানায় একটা জিডি করিয়ে রাখুন। সময় খারাপ, কিছুই বলা যায় না।'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন। ছেলের প্রসঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছে না কিন্তু উপায় নেই। অপ্রিয় বিষয় নিয়েই মানুষকে বেশি কথা বলতে হয়।

'মিজান সাহেব।'

'জ্বি।'

'চিন্তা করবেন না। চিন্তার কিছু নেই। এই বয়েসে ছেলেদের ঘর পালানো রোগ হয়। আমার নিজের ভাগ্নে এই কাজ করল। ফুফাত বোনের ছেলে। রাগ করে বাড়ি থেকে উধাও। দু'মাস ওর কোনো খোঁজ ছিল না পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, রেডিওতে বিজ্ঞাপন—বিরাট হুলুস্থুল। আর কত রকম গুজব। একবার তো খবর পাওয়া গেল

লঞ্চডুবিতে মারা গেছে। বুঝেন অবস্থা, আমার বোন ঘন-ঘন ফিট হচ্ছে.....'

মিজান সাহেব ফাইলে মন দিতে চেষ্টা করলেন। মন বসছে না। ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। মাথায় একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে।

'মিজান সাহেব।'

'জ্বি।'

'থানায় একটা জিডি করিয়ে রাখা দরকার। তাছাড়া এটা একটা নাগরিক কর্তব্য। আমার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে আছে মোহাম্মদপুর থানার ওসি। বলেন তো আমি নিয়ে যাব।'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না। করিম সাহেব বললেন, 'আজ বিকেলে অফিস ছুটির পর যাওয়া যেতে পারে, যাবেন?'

'না।'

কথাবার্তা হয়ত আরো কিছুক্ষণ চলত। গনি সাহেব ডেকে পাঠালেন।

গনি সাহেবকে আজ অন্যদিনের চেয়েও গম্ভীর মনে হচ্ছে। গম্ভীর এবং চিন্তিত। তিনি সিগারেট খান না কিন্তু আজ হাতে সিগারেট। অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে টান দিয়ে খুক খুক করে কাশছেন। মিজান সাহেব বললেন, 'স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন?'

'জ্বি ভালো।'

'বসুন, মিজান সাহেব বসুন।'

মিজান সাহেব বসলেন। গনি সাহেব বললেন, 'কিছু ভেবেছন?'

মিজান সাহেব তাকিয়ে রইলেন। গনি সাহেব বললেন, 'আপনাকে বললাম না, জনহিতকর কিছু করতে চাই। টাকা কোনো সমস্যা হবে না। ঐটা মাথায় রেখে ভাববেন। বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'চা খান।'

গনি সাহেব বেল টিপে চায়ের কথা বললেন। তাঁর সিগারেট নিভে গিয়েছিল, সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'সিগারেট আমি খাই না। কে যেন একটা প্যাকেট ফেলে গিয়েছিল। একটা ধরালাম। এখন মাথা ঘুরছে। আচ্ছা ভালো কথা—গণ্ডগোলটা ধরেছেন? মানে আপনার ঐ হিসাবে?'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন। গনি সাহেব বললেন, 'আমাদের হিসাব পত্রের ব্যাপারগুলি আরো আধুনিক করা দরকার। আমি ভাবছি হিসাব নিকাশের সুবিধার জন্যে একটা কম্প্যুটার রাখলে কেমন হয়? আপনি কি বলেন?'

'আমি তো স্যার ঐসব ঠিক জানি না।'

'আমি নিজেও জানি না। দিনকাল বদলাচ্ছে। আমাদেরও তো সেইভাবে বদলাতে হবে। কি বলেন, ঠিক বলছি না?'

'ঠিকই বলছেন।'

'আমি দু'তিন জন কম্প্যুটারওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা কি বলে জানেন? ওরা বলে হিসাবটা কম্প্যুটারে থাকলে আজ যে সমস্যা আপনার হয়েছে সেই সমস্যা হত না।'

'জ্বি স্যার।'

'আমাদের অফিসের রহমান সাহেবের ছেলের কিডনির কী অসুখ যেন ছিল, কি হয়েছে জানেন?'

'এখন ভালো আছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। কিডনি ট্রান্সপ্লেন্ট হয়েছিল তাই না?'

'জ্বি। তাঁর স্ত্রী কিডনি দিলেন।'

'ভালো। ভালো। খুবই ভালো। ভাবছিলাম একবার দেখতে যাব। খোঁজ নেবেন তো বাসাটা কোথায়?'

'শান্তিনগরে বাসা।'

'ঠিক আছে। একবার যাব। অপারেশনটা হল কোথায়?'

'মাদ্রাজে।'

'বিরাট খরচান্ত ব্যাপার তো।'

'লাখ তিনেক টাকা খরচ হয়েছে স্যার।'

'তা তো হবেই। বিদেশে চিকিৎসা। লাখ তিনেক হলে তো কমই হয়েছে। নিন চা খান। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

মিজান সাহেব চা শেষ করলেন। চা খাবার ফাঁকে ফাঁকে গনি সাহেব দেশ, দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বললেন। মিজান সাহেব উঠে যাবার আগের মুহূর্তে বললেন, 'আমি আপনার কাগজপত্রগুলি বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। ভালো করে দেখতে পারি নি। তবু মনে হল দু'লাখ পঁচাশি হাজার টাকার একটা সমস্যা আছে। তাই না?'

'জ্বি স্যার।'

'চিন্তা করে বের করুন তো কী ব্যাপার! টাকাটা বড় না—যেটা বড় সেটা হচ্ছে—।'

গনি সাহেব জবাব দিলেন না। তাঁর টেলিফোন এসেছে। তিনি টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক ফাঁকে মিজান সাহেবকে বললেন, 'আচ্ছা এখন যান মিজান সাহেব।'

মিজান সাহেব সাধারণত নিজের চেয়ারে বসেই লাঞ্চ খান। আজ লাঞ্চের জন্যে ক্যান্টিনে চলে গেলেন। এই অফিসে ক্যান্টিন চালানোর মতো কর্মচারী নেই। ছোট একটা কামরা আলাদা করা আছে। সেখানে চা এবং বিস্কিটের ব্যবস্থা আছে। মিজান সাহেব ক্যান্টিনের এক কোণায় টিফিন বক্স নিয়ে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। গনি সাহেব খুবই বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি দু'য়ে দু'য়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছেন এটা যে কোনো বোকা লোকও বুঝতে পারবে। মিজান সাহেব ভেবে পেলেন না এই ব্যাপারটা তার বুঝতে এত দেরি হল কেন?

রহমান সাহেব ক্যাশ সেকশনে আছেন আজ ছ'বছর। নিতান্তই নির্বিরোধী মানুষ। কারো সঙ্গেই কোনো কথাবার্তা বলেন না। নীরবে কাজ করেন। মাঝে-মাঝে দু'হাতে মাথার রগ টিপে ধরে ঝিম মেরে বসে থাকেন। এই সময় তাঁর মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয়। তীব্র ও অসহ্য ব্যথা। তাঁর ফর্সা মুখ লাল টকটকে হয়ে যায়। ভুরুর চারপাশে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে। কেউ যদি বলে—কি ব্যাপার রহমান সাহেব। তিনি বলেন—কিছু না। তাঁর ব্যথা কতক্ষণ থাকে কেউ জানে না, কিন্তু তাঁকে কিছুক্ষণের

মধ্যেই আবার কাজ শুরু করতে দেখা যায়। এই সময় তিনি খুব ঘন-ঘন পানি খান কিছুতেই যেন তার তৃষ্ণা মেটে না। তাঁকে বড় অসহায় লাগে।

গনি সাহেব তার সেক্রেটারি মজনু মিয়াকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মজনু মিয়া বিনা কারণে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে। গনি সাহেব যখনই তাকে ডেকে পাঠান তখনই তার মনে হয় এইবার বোধ হয় তিনি বলবেন, 'কাজকর্ম তো তোমার কিছুই নেই, কাজেই তোমাকে শুধু শুধু বেতন দিয়ে পোষার মানে নেই। তুমি বিদেয় হও।' অথচ মজনু মিয়া কাজ করতে চায়। বিনা কাজে দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত অফিসে বসে থাকার যন্ত্রণা আর কেউ না জানুক সে জানে।

'মজনু মিয়া।'

'জ্বি স্যার।'

'ভালো আছ?'

'জ্বি স্যার ভালো।'

'গতকাল কেউ এক জন আমার এখানে এক প্যাকেট সিগারেট ফেলে গেছে। খুঁজে বের কর তো। প্যাকেটটা ফেরত দিতে হবে।'

মজনু মিয়া হতভম্ব হয়ে গেল। কে সিগারেট ফেলে গেছে, সে কী ভাবে খুঁজে বের করবে? এটা কি সম্ভব নাকি? তা ছাড়া এক প্যাকেট সিগারেট এমন কী জরুরি জিনিস?

'কি পারবে না?'

মজনু মিয়া মাথা চুলকাতে লাগল। গনি সাহেব বললেন, 'বের করা খুব সোজা বলেই তো আমার ধারণা। এই অফিসের কেউ আমার সামনে বসে সিগারেট খায় না—তাই না? বাইরের কেউ হবে। গতকাল আমার কাছে কে-কে এসেছে তোমার জানা আছে না? ওদের মধ্যেই কেউ হবে। খুঁজে বের কর, তারপর গাড়ি নিয়ে প্যাকেটটা দিয়ে আসবে এবং বলবে এখানে একটা সিগারেট কম আছে। আমি খেয়ে ফেলেছি। এই জন্যে আমি খুব শরমিন্দা। বলতে পারবে না?'

'পারব স্যার।'

'গাড়ি নিয়ে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

গনি সাহেব পানের কৌটা বের করে একটা পান মুখে দিলেন। বাসায় টেলিফোন করলেন। টেলিফোন ধরল ছোট জামাই। তিনি টেলিফোন কানের কাছে ধরে রাখলেন—ও পাশ থেকে বার-বার শোনা যাচ্ছে, 'হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।'

তিনি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। নামাজের সময় হয়ে গেছে। নামাজ পড়বেন। তিনি ওজুর পানি দিতে বললেন। বাথরুমেই পানির ব্যবস্থা আছে কিন্তু তিনি সে পানি ব্যবহার করেন না। ওজুর জন্যে তিনি পুকুরের পানি ব্যবহার করেন। ড্রামে করে সেই পানি জমা রাখা হয়।

৭

দুপুর বেলা চারদিক কেমন নিঝুম হয়ে থাকে।

ফরিদা বারান্দায় পাটি পেতে শুয়ে থাকেন। বাবলু, লীনা স্কুলে। বীণা সারা দুপুর কুয়াতলায় বসে কি সব বইপত্র পড়ে। সুনসান নীরবতার মধ্যে একমাত্র সরব ব্যক্তি বীণার দাদী। যদিও দুপুর বেলায় তার গলা খাদে নেমে যায়। একঘেয়ে স্বরে তিনি বিড়-বিড় করেন। সেই বিড়বিড়ানির মধ্যে ঘুম পাড়ানো কোনো সুর হয়ত আছে। শুনতে শুনতে ফরিদার ঘুম পেয়ে যায়।

আজও ঘুম পেয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল খট্ খট্ শব্দে। গেট দুপুরে ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। ভিখিরীর দল খানিকক্ষণ খট্ খট্ করে এক সময় বিরক্ত হয়ে চলে যায়। আজ যে এসেছে সে কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে আবার শব্দ করে, ফরিদা বিরক্ত গলায় বললেন, 'বীণা একটু দেখ তো। এরা বড় যন্ত্রণা করে।'

বীণা চিঠি লিখছিল। তার চিঠি লেখার কোনো মানুষ নেই। অথচ কর্মহীন দুপুরে কেন জানি শুধু চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে। অবিশ্যি আজকের চিঠিটি সে লিখছে মালবীকে। মালবীর সঙ্গে তার তেমন কোনো ভাব নেই। তবু মালবী তার একমাত্র বান্ধবী যে হঠাৎ করে তাকে দীর্ঘ চিঠি লিখে বসে। গতকাল মালবীর একটা চিঠি এসেছে। তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—এই খবর জানিয়ে দীর্ঘ চিঠি। ছেলে বাংলাদেশের চায়না এ্যাম্বেসির কালচারাল সেক্রেটারি। হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হয়েছে। দেশ ছেড়ে মালবীকে চলে যেতে হবে এই দুঃখেই সে কাতর। চিঠির জবাব লিখতে গিয়ে বীণার নিজের কেন জানি একটু মন খারাপ লাগছে। সে খাতা বন্ধ করে গেট খুলতে গেল। ভর দুপুরে আজকাল গেট খোলাও বিপজ্জনক। হুট করে কে না কে ঢুকে পড়ে।

বীণা বলল, 'কে?'

নরম গলায় জবাব এল—'বীণা আমি। আমি বুলু। বাবা বাড়িতে?'

বীণা গেট খুলতে খুলতে বলল, 'এইসব কী কাণ্ড দাদা? কোথায় পালিয়েছিলে?'

'বাবা কি বাসায়?'

'না বাবা বাসায় নেই। একি অবস্থা তোমার, ছি ছি।'

বুলু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, 'বাসার অবস্থা কি একটু ঠাণ্ডা?'

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বক-বক করবে, না ভেতরে আসবে? ইস্ কী অবস্থা হয়েছে।'

'মৌলানা সাহেব হয়ে গেছি। কি রকম চাপদাড়ি উঠেছে দেখেছিস?'

ভেতর থেকে ফরিদা বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিসরে বীণা? কে?'

'দাদা এসেছে মা।'

ফরিদা উঠে বসলেন। কি বলবেন বা কি করবেন বুঝতে পারলেন না। এতদিন পর এসেছে। ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, মা হিসেবে সান্ত্বনার কিছু কথা কি বলা উচিত না? নাকি তিনিও রাগ দেখাবেন? মুখ গম্ভীর করে যেভাবে শুয়েছিলেন সেইভাবেই শুয়ে থাকবেন?

বুলু বারান্দায় চলে এল। ফরিদা চমকে উঠলেন। কী চেহারা হয়েছে ছেলের! মুখ

ভর্তি দাড়ি। আটাশ দিনে এত লম্বা দাড়ি হয় নাকি? চুল মনে হচ্ছে জট পাকিয়ে গিয়েছে। মুখটা শুকনো। ফরিদা বললেন, 'পায়ে কী হয়েছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন?'

'কাঁটা ফুটেছে। মা, বাবার রাগ কমেছে?'

'রাগ না কমলে কী করবি আবার পালিয়ে যাবি?'

বুলু লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। হাসি দেখে বড় মায়া লাগল ফরিদার। আহা বেচারা। তিনি নরম গলায় বললেন, 'মানুষ পরীক্ষায় ফেল করে না? ফেল করলে বাড়ি ঘর ছেড়ে দিতে হয়?'

'তিনবার তো কেউ ফেল করে না?'

ফরিদা বললেন, 'ছিলি কোথায়?'

'গ্রামের দিকে ছিলাম।'

'বীণা ওকে গোছলের পানি দে। সাবান দে।'

বীণার দাদী চেঁচাচ্ছেন 'হারামজাদা আইছে? ওই হারামজাদা, এদিকে আয়।'

কুয়ার পাড়ে বুলু গোছল করতে বসেছে। বীণা আছে তার পাশেই। বীণা বলল, 'পিঠ ভর্তি ময়লা দাদা। দাও, গামছাটা আমার কাছে দাও, ঘষে দেই।'

'লাগবে না লাগবে না।'

'আহা দাও না। শরীর এত নোংরা হল কী ভাবে? ইস্ কী ভাবে ময়লা উঠছে! দাদা, মাথায় আরো বেশি করে সাবান দাও তো।'

বুলু বলল, 'তোর রেজাল্ট যে কী প্রথম দুই দিন বুঝতেই পারি নি। নিজেরটা দেখেই অবস্থা কাহিল। থার্ড ডে-তে তোর রেজাল্ট দেখলাম। এত আনন্দ হল বুঝলি—একেবারে চোখে পানি এসে গেল। তোকে মাথায় নিয়ে নাচতে ইচ্ছা করছিল।'

'একবার এসে তো বললেও না।'

'বাবার ভয়ে আসি নি।'

'এখন ভয় করছে না?'

'করছে। খাওয়া-দাওয়া করে আবার পালাব......'

'পাগলামি যথেষ্ট করেছ দাদা।'

ফরিদা নিজেই ছেলের জন্যে একটা ডিম ভেজে আনলেন। খাবার তেমন কিছু নেই। ছোট মাছের তরকারি ছিল—কেমন টক্ টক্ গন্ধ ছাড়ছে। ডালও আছে সামান্য।

'মা একটা শুকনো মরিচ ভেজে দাও তো।'

ফরিদা একটা শুকনো মরিচ ভেজে আনলেন। বুলু এত আগ্রহ করে খাচ্ছে। এতদিন কোথায় ছিল, কী খেয়েছে কে জানে।

মিজান সাহেব সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে ফিরলেন। হাত মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসলেন। ফরিদা বললেন, 'বুলু এসেছে।'

তিনি কিছু বললেন না। ফরিদার মনে হল, কথাটা বোধহয় শুনতে পায় নি। ফরিদা গলা উঁচিয়ে বললেন, 'বুলু এসেছে।'

মিজান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'কতবার এক কথা বলবে? এসেছে ভালো কথা। এখন আমাকে করতে হবে কী? কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে?'

'কিছু বলো না। ভয় পাচ্ছে খুব।'

মিজান সাহেব চা শেষ করেই উঠে পড়লেন। ফরিদা বললেন, 'কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আনন্দে লীনা ও বাবলুর চোখে প্রায় পানি এসে যাবার মতো হল। আজ বৃহস্পতিবার, বাবার বইপত্র নিয়ে বসার দিন। একবার যখন বের হয়ে গেছেন তখন বোধ হয় আর বসা হবে না।

বুলু দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার পর। গা ম্যাজ-ম্যাজ এবং জ্বর-জ্বর ভাব নিয়ে সে শুয়েই রইল। বাঁ পা-টা টাটাচ্ছে।

বীণা চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল। এর আগেও সে কয়েকবার এসেছিল। বুলু ঘুমুচ্ছে দেখে ডাকে নি।

বুলু বলল, 'বাবা আসেন নি?'

'এসেছিলেন, আবার কোথায় যেন গেলেন।'

'আমার প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন?'

'না।'

'চলে যাওয়া দরকার। বাবা আবার ফিরে আসার আগেই বিদায় নেয়া উচিত।'

'বাজে কথা বলবে না দাদা। যা করেছ যথেষ্ট করেছ। বড়াগুলি খাও। শুধু চা খাচ্ছ কেন?'

'গ্রামে—গ্রামে ঘুরছিলাম তো বুঝলি বীণা, অনেক কিছু দেখলাম। আমার আগে ধারণা ছিল আমরাই বোধ হয় সবচে গরীব। শুধু ভাত খাচ্ছে বুঝলি। শুধু ভাত। সাথে কিচ্ছু নেই।'

'তুমি কি ওদের নিয়ে কবিতা-টবিতা লিখলে?'

বুলু কিছু বলল না। লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। বুলুর মধ্যে কিছুদিন পর পর কবিতা লেখার একটা উৎসাহ দেখা যায়। কোনো কবিতাই সে কাউকে দেখায় না, তবে বীণা ব্যাপারটা জানে।

'তুই এম. এ পড়বি না বীণা?'

'জানি না তো। বাবা কিছু বলছে না।'

'বলাবলির কি আছে? ভর্তি হয়ে যা। এম.এ পাশ বোন বলতেই ভালো লাগবে। এম. এ জিনিসটাই অন্যরকম, তাই না?'

'কি জানি।'

'আমি যদি এম.এ পাশ করতে পারতাম তাহলে গ্রামের দিকে কোনো কলেজে মাষ্টারি করতাম। ফাইন হত।'

বুলু ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বীণা বলল, 'সেলুনে গিয়ে দাড়ি-টাড়িগুলো কামিয়ে আস দাদা, বিশ্রী লাগছে। এই নাও।'

বীণা পাঁচ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিল। বুলু হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। তার হাত একেবারে খালি। সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। সিগারেটের অভ্যাসটা তার গ্রামে গিয়ে হয়েছে।

বুলু বাসা থেকে হাত খরচের কোনো টাকা পয়সা পায় না। টুক টাক খরচের

টাকাটা সে একটা প্রাইভেট টিউশানি করে জোগাড় করে। ওদের কাছ থেকে গত মাসের বেতন নেয়া হয় নি। বুলু ঠিক করল আজ রাতেই একবার যাবে। রাত আটটা ন'টার আগে না গেলে ছাত্রের বাবাকে পাওয়া যাবে না। টাকাটা পেলে বীণার জন্যে সামান্য কিছু উপহার কিনবে বলে সে ঠিক করে ফেলল। কী কেনা যায়

শান্তিবাগে রহমানের বাসা খুঁজে বের করতে মিজান সাহেবের অনেক দেরি হল। গলির ভেতর গলি, তার ভেতর গলি। খুঁজে পেতে যে বাড়ি পাওয়া গেল তার অবস্থা দেখে মিজান সাহেব আকাশ থেকে পড়লেন। দোতলা বাড়ির একতলা। বাড়ির এমন অবস্থা, মনে হচ্ছে এক্ষুনি গোটা বাড়ি ভেঙে পড়বে। সদর দরজার সামনেই ডাস্টবিন। রাতে সাধারণত মাছি ওড়ে না অথচ এখানে মাছি ভন–ভন করছে। দুর্গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

দরজার কড়া নাড়তেই রহমান বের হয়ে এল, অবাক হয়ে বলল, 'স্যার আপনি '

'কেমন আছ রহমান '

'জ্বি ভালো।'

'তোমার বাচ্চাটাকে দেখতে এলাম। ও আছে কেমন '

'ভালো আছে স্যার। ও বাসায় নেই, ওর বড় মামার বাড়ি গেছে। যাত্রাবাড়িতে। স্যার ভেতরে আসুন।'

মিজান সাহেব ভেতরে ঢুকলেন। বাড়ির সাজসজ্জা দেখে মনটা খারাপ হল। কি অবস্থা। বসার ঘরে কয়েকটা কাঠের চেয়ার। এককোণে একটা চৌকি। পাটি বিছানো। পাটির ওপর ওয়ারবিহীন তেল চিটচিটে একটা বালিশ।

'স্যার একটু বসুন, আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আসি।'

রহমানের স্ত্রী অসম্ভব রোগা, বালিকা চেহারার একটা মেয়ে। সে শাড়ি বদলে এসেছে। পাটভাঙা শাড়ি ফুলে আছে। মেয়েটি পা ছুঁয়ে মিজান সাহেবকে সালাম করল। মিজান সাহেব খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। রহমান বলল, 'আমার স্যার। উনার কথা তোমাকে বলেছি চিনু।'

মিজান সাহেব বললেন, 'ভালো আছ তুমি করে বলে ফেললাম। আমার বড় মেয়ে তোমার বয়েসী।'

'অবশ্যই তুমি করে বলবেন চাচাজান। অবশ্যই বলবেন। আপনার বড় ছেলে কি ফিরেছে '

মিজান সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ ফিরেছে। ওর কথা তুমিও জান '

'জ্বি ও বলেছে। ও অফিসের সব কথা আমাকে বলে।'

রহমান শার্ট গায়ে দিয়ে বের হয়ে গেছে। খাবার দাবার কিছু কিনবে বোধ হয়। চিনু চৌকিতে বসে গল্প করছে।

'ঘর টরের এমন অবস্থা। আপনি এসেছেন খুব খারাপ লাগছে।'

'আমার নিজের বাড়ি ঘরও খুব ভালো অবস্থায় নেই।'

'ওদের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ ছিল না চাচা। জমিজমা ভালো ছিল। বৎসরের চাল জমি থেকে আসত। সব বিক্রি করতে হল। আড়াই লাখ টাকা জোগাড় করা সোজা

কথা তো না। জমিজমা বসত বাড়ি, আমার সামান্য কিছু গয়না সব গেছে, তারপরেও দশ হাজার টাকা দেনা। কিন্তু আমার কোনো আফসোস নেই। মানুষের জীবনের চেয়ে বড় তো কিছু না। তাই না চাচা? ছেলেটা তো ভালো হয়েছে।'

'তা তো বটেই।'

'আমার এক খালাতো ভাই টাকা দিতে চেয়েছিল ও নেয় নি। ওর আবার আত্মসম্মান খুব বেশি। পরের টাকায় সে ছেলের চিকিৎসা করাবে না। বলেন চাচা, আমাদের মতো মানুষের মুখে এইরকম কথা কি মানায়?'

'মানাবে না কেন? নিশ্চয়ই মানায়।'

'এত বড় ঝামেলা গেল অফিসের কেউ দেখতে আসে নাই। আপনি এসেছেন। ও খুব খুশি হয়েছে। ও অল্পতেই খুশি হয়।'

মিজান সাহেব চুপ করে বসে রইলেন। রহমান খাবার নিয়ে ফিরে এসেছে, দু'টা মিষ্টি, দু'টা সিঙ্গাড়া, চারটা নিমকি। এদের ঘরে বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা নেই। কেতলীতে করে চাও এসেছে।

বুলু যে ছেলেটিকে পড়ায় তাদের বাসা আদাবরে। ছেলেটি ক্লাস ফোরে পড়ে। বুদ্ধিমান ছেলে। কোনো জিনিস একবারের বেশি দু'বার তাকে বলতে হয় না, তবে হাতের লেখা খুব খারাপ। বুলু যা করত সেটা হচ্ছে রোজ চার পাঁচ পাতা করে হাতের লেখা লেখানো। এতেও কোনো লাভ হয় নি, হাতের লেখা যেমন আছে তেমনি রয়ে গেছে।

এ বাড়িতে এসে বুলুর বেশ মন খারাপ হল। বারান্দায় নতুন এক জন মাস্টার ছেলেটাকে পড়াচ্ছেন। মনে হচ্ছে কড়া ধরনের মাস্টার। ছেলেটা বুলুর দিকে তাকাতেই মাস্টার সাহেব কড়া একটা ধমক দিলেন।

ছেলেটার বাবা বাসাতেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে শুকনো মুখে বললেন, 'আপনি যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আর খোঁজ নেই। শেষে নতুন এক জন মাস্টার রেখে দিলাম।'

'ভালো করেছেন।'

'মাস্টারও ভালো। কড়া ধরনের......।'

'কড়া মাস্টারই ভালো।'

'আপনার বোধ হয় কিছু টাকা-পয়সা পাওনা আছে। সামনের সপ্তাহে একবার আসুন দেখি। হিসাব টিসাব করে দেখি।'

বুলু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এক মাসের বেতন বাকি। সামান্য ক'টা টাকা, এর এত হিসাব নিকাশ কি?

'বসুন চা খেয়ে যান।'

'জ্বি না থাক।'

'সামনের সপ্তাহে একবার আসুন। বুধবারে চলে আসবেন।'

বুলু কিছু বলল না। বাঁ পায়ের ব্যথা বেশ বেড়েছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'দাড়ি রেখেছেন ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কিছু না এমনি রাখলাম।'

'আচ্ছা আসুন সামনের সপ্তাহে।'

বাড়ির গেটের কাছে বুলুর সঙ্গে মিজান সাহেবের দেখা হয়ে গেল। মিজান সাহেব খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বুলু ভেবেছিল—কিছু নিশ্চয়ই বলবেন।

তিনি কিছুই বললেন না। দু'জন মানুষ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। অথচ কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। বেশ কিছু সময় পর মিজান সাহেব বললেন, 'দাড়ি রেখেছিস কেন?'

বুলু জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোর পায়ে কী হয়েছে? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন?'

বুলু চুপ করে রইল।

'কথা বলছিস না যে, কথা বলা ভুলে গেছিস?'

বুলু ভেবেছিল বাবা বলবেন, 'যা সেলুন থেকে দাড়ি কেটে পরিষ্কার হয়ে আয়।' তিনি তা বললেন না।

'বুলু।'

'জ্বি।'

'তোর চেহারা আমি দেখতে চাই না। তুই যেখানে গিয়েছিলি সেখানেই যা।'

'এখন চলে যাব বাবা?'

মিজান সাহেব এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। বুলু কী করবে বুঝতে পারল না। সে কি এখনি চলে যাবে? না দু'একটা দিন অপেক্ষা করবে? বড্ড ক্লান্ত লাগছে। আজ রাতটা কি বাবা তাকে থাকতে দেবেন?

৮

ডারমাটোলজিস্ট প্রফেসর বড়ুয়া হাসতে হাসতে বললেন, 'এটা তো কিছুই না। এক ধরনের ফাংগাস। নিম্নশ্রেণীর এককোষী উদ্ভিদ।'

বোরহান সাহেব বললেন, 'ভাই ভালো করে দেখুন।'

'ভালো করেই দেখেছি। এইসব ফাংগাসরা অনেক জায়গায় বংশ বিস্তার করতে পারে। মানুষের চামড়া তাদের বংশ বিস্তারের জন্যে ভালো জায়গা। আমি একটা মলম দিচ্ছি গোসলের পর চামড়ায় লাগাতে হবে।'

অলিক বলল, 'লাগালেই সেরে যাবে?'

'অবশ্যই সারবে।'

'কতদিন লাগবে সারতে?'

'এই ধর সাত দিন। দাগ পুরোপুরি মেলাতে দশ পনের দিন লাগতে পারে।'

অলিক বলল, 'আপনি কি ভালোমতো দেখেছেন ডাক্তার সাহেব?'

প্রফেসর বড়ুয়া খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। এক জন এম আর সি পি ডাক্তারকে ঘন ঘন যদি বলা হয় আপনি কি ভালোমতো দেখেছেন তাহলে খুব সঙ্গত কারণেই তাঁর রাগ হবার কথা।

বোরহান সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা তুমি একটু বাইরে যাও

আমি উনার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

অলিক বলল, 'আমার সামনেই বল। তোমার এমন কোনো কথা নেই যা আমার সামনে বলা যাবে না। মার কথাই তো তুমি বলবে তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বল। আর তোমার যদি বলতে অস্বস্তি লাগে তাহলে না হয় আমিই বলি।'

বোরহান সাহেব চুপ করে গেলেন। স্ত্রীর প্রসঙ্গে কথা বলতে আসলেই তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। অলিক খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বেশ সহজভাবেই বলল, 'ডাক্তার সাহেব আমার মায়ের চামড়াতেও ঠিক একই রকম হলুদ রঙের দাগ হয়েছিল, তারপর সেগুলো হয়ে গেল কালচে। এখানকার ডাক্তাররা বললেন—কিছুই না—এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ। ওষুধ দিলেন। কিছুই হল না। ওষুধ বদলানো হল—কিছুই না, দাগ বাড়তে লাগল, শুরু হল যন্ত্রণা। মাকে আমরা বিলেত নিয়ে গেলাম। সেখান থেকে আমেরিকার জন হপকিন্স হাসপাতালে। ডাক্তাররা বললেন—এটা একটা অজানা চর্মরোগ। এই অসুখেই মা মারা যান।'

প্রফেসর বড়ুয়া তাকিয়ে আছেন।

বোরহান সাহেব বললেন, 'এখনো কি আপনার ধারণা আমার মেয়ের গায়ে যে দাগ সেগুলো ফাংগাসের জন্যে?'

'অবশ্যই। আপনার স্ত্রীকে আমি দেখি নি কাজেই তাঁর কী হয়েছিল আমি বলতে পারব না। এই মেয়েকে আমি দেখেছি। ওষুধ লিখে দিলাম। আচ্ছা থাক ওষুধ কিনতে হবে না, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে স্যাম্পল আছে। আপনি সাত দিন পর আসবেন। অবশ্যই আসবেন।'

'আসব।'

'যে সব প্রেসক্রিপশন আপনার স্ত্রীকে ডাক্তাররা করেছিলেন সেগুলো কি আছে?'

'থাকার কথা নয়। আমি খুঁজে দেখতে পারি।'

অলিক বলল, 'ডাক্তার সাহেব আমার অসুখটা যদি আপনার কাছে এতই সহজ মনে হয় তাহলে আপনি মার প্রেসক্রিপশন খুঁজছেন কেন?'

'তোমার চিকিৎসার জন্যে খুঁজছি না। আমি খুঁজছি আমার একাডেমিক ইন্টারেস্টে। তোমার নাম কি খুকী?'

'অলিক।'

'সাত দিন পর দেখা হবে।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়েই অলিক বলল, 'মাত্র সাড়ে চারটা বাজে। আমার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না বাবা। চল কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করা যাক।'

'কোথায় ঘুরবি?'

'ঢাকা শহরে কি কোথাও শিমুল গাছ আছে? আমার একটা শিমুল গাছ দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'শিমুল গাছ?'

'হ্যাঁ। শিমুল গাছ SilkCottonPlant. শিমুল গাছ নিয়ে অপূর্ব একটা কবিতা পড়লাম। শব্দ করে বিচিগুলো ফাটে তারপর বাতাসে ভাসতে ভাসতে তুলা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—সত্যি বাবা?'

'আমি বলতে পারছি না—আমার অবস্থাও তোর মতো, শিমুল গাছ দেখা হয় নি। বা দেখলেও কী ভাবে কি হয় জানি না।'

'কোন সময়টা তুলা বের হয় তা জান?'

'তাও জানি না। চল বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে খোঁজ নেই।'

'বাগানের সাজানো গাছ দেখতে ইচ্ছা করছে না বাবা। বাগানের সাজানো গাছ মানে পোষা গাছ। আমি দেখতে চাই বন্য গাছ।'

'তাহলে খোঁজ খবর করে একটু গ্রামের দিকে যেতে হয়।'

'বেশ তাই চল।'

'আজ তো আর হবে না।'

'আগামীকাল চল। আজ তুমি আমাকে একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বাসায় চলে যাবে। রাতে ফিরতেও পারি নাও ফিরতে পারি।'

'তার মানে।'

'যদি থাকতে ইচ্ছা করে থেকে যাব।'

'কার বাসা?'

'বীণাদের বাসা। যদি রাতে থেকে যাই তোমার আপত্তি হবে না তো?'

'আপত্তি হবে কেন? আমি বরং রাত দশটার দিকে গাড়ি পাঠাব, তোর যদি আসতে ইচ্ছা হয় চলে আসবি। আসতে ইচ্ছা না হলে গাড়ি ফেরত পাঠাবি।'

'গাড়ি পাঠাতে হবে না বাবা। তোমার ভয় নেই, রাত দশটায় আমি একা একা রওনা হব না।'

বোরহান সাহেব মেয়েকে বড় রাস্তায় নামিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'ওষুধটা আজ রাত থেকেই শুরু করিস মা।'

'করব। আজ রাতে থেকেই শুরু হবে।'

বীণাদের বাড়িতে এর আগে একবারই এসেছিল—এত বছর পর ঠিকানা ছাড়া সেই বাড়ি খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার। ঢাকা শহর সাপের মতো বছরে একবার খোলস ছেড়ে নতুন হচ্ছে। অলিক পুরোপুরি ধাঁধায় পড়ে গেল। আগে গ্রামগ্রাম একটা ভাব ছিল, এখন রীতিমতো শহুরে এলাকা। শুধু রাস্তা বেশি বদলায় নি। রাস্তাটা চেনা যাচ্ছে।

অলিক বীণার বাবার নাম জানে না—জানলে দোকানে বা লন্ড্রিতে জিজ্ঞেস করা যেত—অমুক সাহেবের বাসা কোনটা। বীণাদের ভাইদের কারুর নাম জানলে অল্পবয়সী ছেলেদের জিজ্ঞেস করা যেত। এখন সে যা জিজ্ঞেস করতে পারে তা হচ্ছে বীণাদের বাড়ি কোনটা? সুন্দর মতো একটা মেয়ে—লম্বা, ফর্সা এবার বি.এ পাশ করেছে। পাড়ার ছেলেরা নিশ্চয়ই সুন্দরী মেয়েরা কে কোথায় থাকে জানে।

দেখা গেল কেউ জানে না। সম্ভবত এ পাড়ায় অনেকগুলো সুন্দরী মেয়ে থাকে এবং তাদের সবাই একটি বাড়িতে থাকে যে বাড়ির কর্তা এক জন উকিল। সুন্দরমতো একটা মেয়ে বলতেই সবাই বলে—'ও আচ্ছা উকিল সাহেবের মেয়েদের কথা বলছেন? উত্তরের তিন তলা বাড়িতে চলে যান।'

অলিকের মনে আছে বীণাদের বাড়ি একতলা। বাড়িতে চমৎকার একটা কুয়া

আছে। কুয়ার পাড়ে একটা ফুলের গাছ। ফুল গাছের নাম মনে নেই, তবে সাদা রঙের ফুল যার গন্ধ খুবই হালকা।

অলিক এক ঘন্টার মতো হাঁটাহাঁটি করল। এক ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করেও সে তেমন ক্লান্তি বোধ করছে না। বরং মজাই লাগছে। এক ধরনের চ্যালেঞ্জ বোধ করছে। সে ঠিক করে ফেলল সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত সে খুঁজবে। সূর্য ডুবে যাবার সঙ্গে–সঙ্গে উকিল সাহেবের বাসায় যাবে। তাঁর সুন্দরী মেয়েগুলোকে দেখে সেই বাসা থেকেই বাবাকে টেলিফোন করে বলবে গাড়ি পাঠাতে। উকিল যখন, তখন নিশ্চয়ই বাসায় টেলিফোন আছে।

অলিককে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না—তার আগেই গুণ্ডামতো মুখ ভর্তি দাড়ি গোফওয়ালা এক ছেলে এসে বলল, 'আপনি নাকি বীণা নামের একটা মেয়েকে খুঁজছেন।'

অলিক বলল, 'আপনাকে কে বলল?'

'চায়ের দোকানে শুনলাম। আসুন আমার সঙ্গে।'

'আপনার সঙ্গে যাব কেন? আপনাকে দেখে গুণ্ডা বলে মনে হচ্ছে।'

দাড়িওয়ালা লোকটা হেসে বলল, 'আমি বীণার বড় ভাই। আমার নাম বুলু।'

'আপনি যে তার ভাই তারই বা প্রমাণ কি?'

'মুখে দাড়ি না থাকলে চিনতে পারতেন। আমরা সব ভাইবোন দেখতে এক রকম।'

'বীণা বাসায় আছে?'

'জ্বি আছে।'

'উকিল সাহেবের বাসা কোনটা জানেন?'

'কোন উকিল সাহেবের বাসা?'

'যার অনেকগুলো রূপবতী মেয়ে আছে।'

'জানি না তো।'

'সে কী, আপনি জানেন না? সবাই তো জানে। আসুন আমার সঙ্গে। আমি চিনি। ঐ বাসায় খানিকক্ষণ বসে তারপর আপনার সঙ্গে যাব।'

বুলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই ধরনের একটি মেয়ের সঙ্গে বীণার পরিচয় আছে এটা ভাবতেই তার অবাক লাগছে। বুলু মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

'আপনি মুখ ভর্তি দাড়ি রেখেছেন কেন?'

বুলু হাসতে হাসতে বলল, 'পরীক্ষায় ফেল করে দাড়ি রেখে ফেলেছি।'

'পরীক্ষায় ফেল করলে দাড়ি রাখতে হয় জানতাম না তো। ইন্টারেস্টিং। আপনারা না হয় দাড়ি রাখলেন। আমরা মেয়েরা কী করব? আমাদের তো দাড়ি রাখার উপায় নেই।'

'চুল কেটে ফেলতে পারেন।'

'মন্দ না। আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন কেন। আপনার বাঁ পা টা কি শর্ট?'

'বাঁ পায়ে কাঁটা ফুটেছে।'

'কাঁটা তো গলায় ফোটে জানতাম। পায়েও ফোটে।'

'হ্যাঁ ফোটে।'

'আপনি খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করেন নাকি?'

বুলুর ধারণা হল মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। এক জন সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে এরকম অনর্গল কথার পিঠে কথা এক জন অপরিচিত ছেলের সঙ্গে বলবে না। আশ্চর্য, এমন মজার একটি মেয়েকে বীণা চেনে অথচ কোনোদিন এই মেয়েটার কথা সে তাদের বলে নি।

উকিল সাহেব বা উকিল সাহেবের মেয়েদের কাউকেই পাওয়া গেল না। গেটে বিরাট তালা।

অলিক বলল, 'চলুন যাওয়া যাক। আপনাদের বাসা কি অনেকখানি দূর?'

'না, দূর না, কাছেই। ঐ যে চায়ের দোকানটা দেখা যাচ্ছে, ওর পেছনে।'

'আরো একটু দূর হলে ভালো হত, কথা বলতে বলতে যাওয়া যেত। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে।'

বুলু হকচকিয়ে গেল। এই পাগল মেয়ে বলে কি? অলিক হাসি মুখে বলল, 'আপনি এত ঘাবড়ে গেলেন কেন? মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা আপনার অভ্যেস নেই তাই না? আমার সামান্য কথা শুনেই আপনার ধারণা হয়েছে আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। শুনুন আপনাকে একটা জরুরি কথা বলি। কুড়ি পার হওয়া মেয়েরা খুব হিসেবী, তারা চট করে কারো প্রেমে পড়ে না। দাড়ি গোফের জঙ্গল হয়ে আছে এমন ছেলেকে তো নয়ই।'

বুলু স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনি চাইলে আমি দাড়ি গোফ কামিয়ে ফেলতে পারি।'

অলিক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আশেপাশের সবাইকে সচকিত করে খিল খিল শব্দে হেসে উঠল। অনেকদিন এমন গাঢ় আনন্দে সে হাসে নি।

'ভালো কথা আপনি শিমুল গাছের ইংরেজি কী জানেন?'

'জ্বি না। আমি কোনো গাছের ইংরেজিই জানি না। শুধু জানি গাছ হচ্ছে ট্রি।'

'শিমুল গাছের ইংরেজি হচ্ছে Cotton seed tree. আপনি কি শিমুল গাছ দেখেছেন?'

'দেখব না কেন? আমার পায়ে যে কাঁটা ফুটেছে সেটা হচ্ছে শিমুল কাঁটা।'

'কী বললেন?'

'শিমুল কাঁটা ফুটে আমার অবস্থা কাহিল।'

'বাহ্ চমৎকার তো। কী আশ্চর্য যোগাযোগ।'

বুলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটির কথাবার্তা সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

ফরিদা খুবই বিব্রত বোধ করছেন ঘরে রাতে তেমন কিছুই রান্না হয় নি। দুপুরের ইলিশ মাছের তরকারি সামান্য ছিল ঐ দিয়েই টেনে টুনে রাতটা পার করে দেবেন ভেবেছিলেন—এখন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বীণা এক ফাঁকে এসে বলে গেছে, 'মা, ও রাতে এখানে থাকতে চায়।'

ফরিদা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রাতে থাকার দরকার কি?'

'থাকতে চাচ্ছে, এখন কী করে বলি থাকা যাবে না।'

'থাকার দরকারটা কি?'

'ওর মাথার ঠিক নেই মা?'

'এ রকম মাথা খারাপ মেয়ের সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হল কী ভাবে?'

'ও খুব ভালো মেয়ে মা। ওর সঙ্গে ভালো করে না মিশলে তুমি বুঝবে না।'

'আমার এত বোঝার দরকার নেই। এখন তোর বাবা এসে কী করে সেইটাই হচ্ছে কথা। চেঁচামেচি না করলেই হল। ও ঘুমুবে কোথায়?'

'ও বলছে ঘুমুবে না। কুয়ার পাড়ে বসে সারা রাত গল্প করবে।'

'মেয়েটা কি সত্যি-সত্যি পাগল নাকি?'

ফরিদা মেয়েটিকে ঠিক অপছন্দও করতে পারছেন না। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মিশছে। যেন এটা তার নিজের বাড়ি।

রাত আটটার দিকে মিজান সাহেব বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে লক্ষ করলেন ফুটফুটে একটা মেয়ে বীণার শাড়ি পরে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসু চোখে ফরিদার দিকে তাকাতেই ফরিদা হড়বড় করে বললেন, 'বীণার বন্ধু, মেয়েটার মা নেই। খুব দুঃখী মেয়ে। আজ রাতটা বীণার সঙ্গে থাকতে এসেছে। তুমি রাগারাগি করবে না।'

মিজান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বীণার বন্ধু—এক রাত থাকবে আমি তাতে রাগ করব কেন? কি বলছ এসব?' ফরিদা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেন।

'ডাক মেয়েটাকে।'

ফরিদা অলিককে ডাকতে যাচ্ছিলেন, মিজান সাহেব বললেন, 'থাক পরে কথা বলব। খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা করেছ?'

'কিছু তো ঘরে নাই।'

'কিছু একটা কর। বীণার যেন মনটা ছোট না হয়। ও এমন মুখ কালো করে ঘুরছে কেন?'

'ভয় পাচ্ছে—তুমি যদি কিছু বল।'

'আমি কিছু বলব কেন? আমার মেয়ের এক বন্ধু এক রাত আমার বাসায় এসে থাকতে পারবে না? এতে আমি রাগ করব? এরা আমাকে ভাবে কী?'

মিজান সাহেব বড়ই বিরক্ত হলেন। বুলুকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালেন। যদি কিছু পাওয়া যায়।

নিজেই গিয়ে দৈ কিনে আনলেন। বারান্দায় পাটি পেতে খাবার ব্যবস্থা হল। মিজান সাহেবের ইচ্ছা—সবাই যেন এক সঙ্গে বসে। অলিক খুবই সহজভাবে মিজান সাহেবের পাশে এসে বসল এবং হাসি মুখে বলল, 'চাচা এরা সবাই আপনাকে এত ভয় পায় কেন বলুন তো? আপনার দুপাশের দু'টি থালা বাদ দিয়ে সবাই বসেছে। এরা এত ভয় পায় আপনাকে, আপনার খারাপ লাগে না?'

মিজান সাহেব সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'খারাপ লাগে মা। খুবই খারাপ লাগে। বীণা, তুই আয়, আমার এই পাশে বোস।'

বীণা জড়সড় হয়ে বাবার পাশে এসে বসল। মিজান সাহেব অলিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আরেকদিন এসে এখানে থাকবে মা, কেমন? আজ তোমাকে শুধু ভাত খেতে হল। আমি খুবই লজ্জিত।'

রাতটা ছিল চমৎকার।

আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। লক্ষ লক্ষ তারা ফুটেছে। চমৎকার বাতাস। দুই বান্ধবী কুয়া তলায় বসে গল্প করছে। গল্প অবশ্যি করছে অলিক, শুনছে বীণা।

'বুঝলি বীণা, কবিতা লেখা বাদ দিয়ে আমি একটা বড় গল্প লিখব বলে ভাবছি। সেই বড় গল্পটাই তোকে শোনাতে এসেছি। গল্পের শেষটা কী হলে ভালো হয় সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'গল্পটা শুরু হচ্ছে আমার মতো বয়েসী একটা মেয়েকে নিয়ে। চমৎকার একটি মেয়ে, রূপবতী, ইন্টেলিজেন্ট, ফুল অব লাইফ। হঠাৎ মেয়েটা জানতে পারল তার ভয়াবহ একটা অসুখ হয়েছে। তার আয়ু আছে ছ'মাসের মতো। শুরুটা কেমন রে?'

'খুব সাধারণ, লক্ষ লক্ষ এ রকম গল্প আছে। খুব ট্রাজিক শুরু।'

'আমার গল্পটা অন্য গল্পের মতো না। আমার গল্পের মেয়েটা ছ'মাস আয়ুর ব্যাপারটা বেশ সহজভাবে নিল। ঠিক করল জীবনটা মোটামুটি যতটুকু পারে ভোগ করবে। মেয়েটির কোনো যৌন অভিজ্ঞতা নেই অথচ ব্যাপারটা কী তা সে জানতে চায়......।'

বীণা বলল, 'কি সব আজে-বাজে কথা শুরু করলি। চুপ কর তো।'

'এটা আজে-বাজে হবে কেন? সারা পৃথিবী জুড়ে যে জিনিসটা নিয়ে এত মাতামাতি, মানুষের এত আগ্রহ, এত কৌতূহল সেইটা যদি একটা মেয়ে মরবার আগে জেনে যেতে চায় তাতে দোষের কী?'

'একটা শালীনতার ব্যাপার আছে না?'

'যে মেয়ে দু'দিন পর মরে যাচ্ছে তার আবার শালীনতা কি?'

'আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, তুই তোর গল্প বল।'

'এখন মুশকিল কি হয়েছে জানিস? মুশকিল হচ্ছে মেয়েটা তার এই কৌতূহল কী ভাবে মেটাবে বুঝতে পারছে না। সে তো আর কোনো এক জনকে বলতে পারে না—ভাই আজ রাতে আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে ঘুমুবেন?'

বীণা হেসে ফেলল।

অলিক বলল, 'বাইরে থেকে মেয়েটাকে যথেষ্ট স্মার্ট মনে হলেও আসলে সে লাজুক ধরনের একটা মেয়ে এবং খুব ভালো মেয়ে।'

বীণা বলল, 'এই তোর গল্প?'

'হুঁ।'

'গল্প তোকে দিয়ে হবে না। তুই বরং কবিতাই চালিয়ে যা।'

অলিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বীণা বলল, 'তুই এমন মন খারাপ করে ফেললি কেন?'

'বুঝতে পারছি না। মাঝে-মাঝে আমার এরকম হয়। অল্পক্ষণের জন্যে মন খারাপ হয়। তোর হয় না?'

বীণা হেসে বলল, 'আমার বেশিরভাগ সময়ই মন খারাপ থাকে। মাঝে-মাঝে মন ভালো হয়। আমরা দু'জন সম্পূর্ণ দু'রকম।'

অলিক বলল, 'এসব কচকচানি বাদ দে, আয় একটা কবিতা শোন।'

'তোর লেখা?'
'না ডাবলিউ মরিখের লেখা। অসাধারণ।'

"He did not die in the night,
He did not die in the day,
But in the morning twilight
His spirit pass'd away,
When neither sun nor moon was bright,
And the tree were merely grey."

৯

বুলুর পা কিছুতেই সারছে না। আজ পায়ের যন্ত্রণায় তার জ্বর এসে গেল। গ্রিন ফার্মেসির ডাক্তার এক গাদা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—ভেতরে কাঁটা রয়ে গেছে বোধ হয়। কেটে বের করতে হবে। আপনি বরং কোনো একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান। বুলু অবাক হয়ে বলল, 'সামান্য কাঁটা ফুটার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হব?'

'কাঁটাটা বের করা দরকার না? পা নিয়ে এতদিন কষ্ট করছেন। এর কোনো মানে হয়?'

কোনোই মানে হয় না তবু বুলু তার অচল পা নিয়েই আদাবরে চলে গেল। আজ বুধবার টিউশ্যানির টাকাটা যদি আদায় হয়। ছাত্রের বাবা বিরক্ত মুখে দেখা দিলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'ও আচ্ছা আপনি? বাসায় অনেক গেস্ট। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না মাস্টার সাহেব। বিয়ের একটা আলাপ চলছে। আপনি এক কাজ করুন, সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে চলে আসুন।'

বুলু ভেবেই পেল না বিয়ের আলাপের সঙ্গে তার বেতনের সম্পর্কটা কী? অনেক কষ্টে সে অর্ধেক পথ হেঁটে শেষ পর্যন্ত রিকশাই নিয়ে নিল। পকেটে শেষ সম্বল চারটা টাকা রিকশাওয়ালাকে দিয়ে দিতে হবে এই দুঃখে তার প্রায় কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করছে। তিন বার বি.এ ফেল করা ছেলে হাত খরচের টাকা চাইতে পারে না। চাওয়া সম্ভব নয়।

পায়ের ব্যথা বড়ই বাড়ছে। পা শরীরেরই অংশ অথচ মনে হচ্ছে এটা শরীরের অংশ না। পা বিদ্রোহ করে বসেছে। কে জানে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হয়ত আলাদা জীবন আছে।

ব্যথা ভুলে থাকার জন্যই বুলু রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করল। এই রিকশাওয়ালা তেমন আলাপী না। যাই জিজ্ঞেস করা হয় সে এক অক্ষরে জবাব দিতে চেষ্টা করে।

বুলুর মনে হল—রিকশাওয়ালাদের জীবন বোধ হয় তেমন মন্দ না। তাদেরকে তিন-তিন বার বি.এ ফেল করার যন্ত্রণা পেতে হয় না। এই কষ্টের তীব্রতা সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই নেই। যে কোনো শারীরিক কষ্টই সহনীয়। শরীর নির্দিষ্ট মাত্রা

পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করবে তার চেয়ে বেশি হলে—অজ্ঞান। নিশ্চিন্ত ঘুমের মতো একটা ব্যাপার। তিনবার বি. এ ফেল করে কেউ অজ্ঞান হয় না। হতে পারলে ভালো হত।

বুলু এখন কী করবে?

আবার পরীক্ষা?

কোনো মানে হয় না।

চাকুরি?

চাকুরি তাকে কে দেবে? পিওনের চাকরির জন্যেও আজকাল এম.এ পাশ ছেলে দরখাস্ত করে বসে। ঐদিন পত্রিকায় দেখছিল স্টোর কিপারের একটা চাকরির জন্যে একুশ জন এম.এ পাশ ছেলে দরখাস্ত করেছে। তিন জনের আছে এম ফিল ডিগ্রি। অথচ চাওয়া হয়েছে ম্যাট্রিক পাশ ছেলে।

সে নিজেও একবার ইন্টারভ্যু দিয়েছিল। সরকারি চাকরির ইন্টারভ্যু। ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশনে প্রুফ রিডার। তার ইন্টারভ্যুর সিরিয়াল হল ১৪০৩। চার দিন ধরে ইন্টারভ্যু চলছে। সে পঞ্চম দিনে বোর্ডের সামনে ঢুকল। বোর্ডের চার জন মেম্বার। চার জনেরই বিধ্বস্ত অবস্থা। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই চার জন একসঙ্গে পাগল হয়ে যাবে।

বুলু অনেকক্ষণ তাদের সামনে বসে রইল কেউ কোনো প্রশ্ন করে না। বুড়ো এক ভদ্রলোক তার পাশের ভদ্রলোককে বললেন, 'কিছু জিজ্ঞেস করুন।' সে মহাবিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি করুন না কেন? আপনার অসুবিধাটা কী?' অপেক্ষাকৃত কম বয়সের এক জনকে দেখা গেল তার সামনে রাখা প্যাডে কী সব ডিজাইন আঁকছে। এবং মুখ বিকৃত করে চোখের সামনে ধরছে। বড় মায়া লাগল বুলুর। এই লোকগুলো দিনের পর দিন ইন্টারভ্যু নিয়ে যাচ্ছে। আরো কত দিন নেবে কে জানে। তাদের মনে এখন হয়ত কোনো প্রশ্নই আর আসছে না। এরা নিশ্চয়ই রাতেও ইন্টারভ্যুর দুঃস্বপ্ন দেখছে।

বুলু বলল, 'স্যার আমি তাহলে যাই?'

এই কথায় বোর্ডের সবার মধ্যেই যেন আনন্দের একটা হিল্লোল বয়ে গেল। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা বাবা যাও।'

ডিজাইন যে করেছিল সেও এই প্রথমবারের মতো প্রসন্ন মুখে তার ডিজাইনের দিকে তাকাল।

আজকাল ব্যবসা কথাটা খুব চালু হয়েছে। পাশ করেই ছেলেরা ব্যবসায় নেমে পড়ছে। ব্যবসা কীভাবে করতে হয় বুলু জানে না, শুধু একটা জিনিস জানে। ব্যবসা করতে টাকা লাগে। আচ্ছা বাংলাদেশে এমন কোনো ব্যবসা কি আছে যেখানে টাকা লাগে না? বুলুদের মতো ছেলেদের জন্যে এই জাতীয় কিছু ব্যবসা থাকলে মন্দ হত না।

রিকশার কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। বার–বার চেইন পড়ে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা তিক্ত বিরক্ত হয়ে কোত্থেকে একটা ইট এনে শব্দ করে কিসে যেন খানিকক্ষণ পেটাল। তাতেও লাভ হল না। আবার চেইন পড়ে গেল। রিকশাওয়ালা কর্কশ গলায় বলল, 'হালার রিকশা।' বুলুর ইচ্ছা হল রিকশাওয়ালাকে বলে—ভাই তোমার কোনো দোষ নেই, দোষ আমার। আমাকে রিকশায় তুলেছ বলে এই অবস্থা। আমাকে না তুলে অন্য কাউকে তুললে এতক্ষণ পৌঁছে যেতে। বেচারা রিকশাওয়ালা

রিকশার হাতল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বুলু বলল, 'ভাই আমার পায়ের অবস্থা খারাপ নয়ত হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম।' রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। কি যেন বিড় বিড় করে বলল। সম্ভবত সেও তার ভাগ্যকে গালাগালি করছে।

ভাগ্য বেচারার জীবন গেল গালি খেয়ে। এই পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে যে তার ভাগ্যকে গালি দেয় না? সবাই দেয়।

বুলু তার চিন্তার স্রোত বদলাতে চেষ্টা করল। এক খাত থেকে চিন্তাটা অন্য খাতে নিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। চিন্তা নদীর স্রোতের মতো। এর গতি বদলানো কঠিন তবে বুলু পারে। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে এটা সম্ভব হয়েছে। সে ভাবতে শুরু করল—একটা নতুন ধরনের গ্রহের কথা। যে গ্রহটা অবিকল পৃথিবীর মতো। মানুষগুলোও পৃথিবীর মানুষের মতো। তবে তাদের জীবনে অনেকগুলো ভাগ আছে। সেই গ্রহে সবারই কিছু সময় কাটে দারুণ সুখে, কিছুটা দুঃখে, কিছুটা জেলখানায়, কিছুটা দেশ-বিদেশ ঘুরে। সব রকম অভিজ্ঞতা শেষ হবার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে মানব সন্তান তোমার জীবনে কোনো অপূর্ণ বাসনা আছে?' যদি সে বলে—'হ্যাঁ আছে।' তাহলে তাকে সেই বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ দেয়া হয়। যতদিন না তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয় ততদিন তার মৃত্যু নেই।

বুলুর কল্পনায় অনেক ধরনের পৃথিবী আছে। সুন্দর পৃথিবীর মতো কুৎসিত পৃথিবীও আছে। সেই পৃথিবীর সব মানুষই নোংরা ও কদাকার। হৃদয়ে ভালবাসা বা মমতা বলে কিছু নেই। যা আছে তার নাম ঘৃণা। সেখানকার সব মানুষ পঙ্কিল জীবন যাপন করে। সেই পৃথিবীতে কোনো চাঁদ নেই। রাতের স্নিগ্ধতা নেই। সব সময় সেই পৃথিবীর আকাশে দু'টি গনগনে সূর্য।

'স্যার নামেন।'

বুলু নামল। রিকশাওয়ালা দরদর করে ঘামছে। শরীরের সমস্ত পানি ঘাম হয়ে বেরিয়ে আসছে। টাকা থাকলে বুলু এই বেচারাকে একটা ঠাণ্ডা পেপসি খাওয়াত। টাকা নেই। আচ্ছা, রিকশাওয়ালাদের গায়ের ঘাম নিয়ে কি কোনো কবিতা আছে? একটা চমৎকার কবিতা কি লেখা যায় না? যেমন রিকশাওয়ালার গায়ের ঘাম শুকিয়ে শরীরে লবণের পর্দা পড়েছে। যা দেখাচ্ছে দুধের সরের মতো।

চার টাকা ভাড়া ঠিক করা হয়েছিল। চার টাকা দিয়ে বুলু রিকশা থেকে নামল। তার বেশ লজ্জা করছে। পকেটে দু'টা সিগারেট আছে। দু'টা সিগারেটের একটা কি সে দেবে রিকশাওয়ালাকে? ব্যাপারটা খুব নাটকীয় হয়ে যায় না?

বুলু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সিগারেট এগিয়ে দিল। নরম গলায় বলল, 'নেন ভাই একটা সিগারেট নেন।'

রিকশাওয়ালা হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। লোকটা খুশি হয়েছে। খুশি নামের ব্যাপারটাও বেশ মজার। এটা একই সঙ্গে অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। কাজেই কোনো একটি বিশেষ ঘটনায় একটা মানুষ কতটুকু খুশি হবে তা কোনোদিন বলা যাবে না।

এই রিকশাওয়ালা অসম্ভব খুশি হয়েছে। সে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে হাসি মুখে বলল, 'কি সিগারেট বানায় আইজ কাইল 'টেস' আর নাই। কী কন ভাইজান? আগে

বগলা সিগারেট ছিল একটা টান দিলে জেবনের শান্তি। কী ধাখ! ঠিক কইলাম না ভাইজান?'

'জ্বি ঠিকই বলেছেন।'

'ভাইজানের পায়ে হইল কি?'

'কাঁটা ফুটছে।'

'আহা কন কি? আস্তে আস্তে যান।'

রাতে বুলু কিছু খেল না।

ক্ষিধে নেই।

এক গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে পড়ল। পায়ের যন্ত্রণা খুব বেড়েছে। মনে হচ্ছে হাসপাতালে শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে হবে। হাসপাতালে কী করে ভর্তি হতে হয় কে জানে! কাউকে গিয়ে নিশ্চয়ই বলতে হবে—ভাই আপনাদের এখানে আমি ভর্তি হতে চাই। দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন। কিংবা দরখাস্ত করতে হবে। আজকাল একটা সুবিধা হয়েছে দরখাস্ত বাংলায় করলেই হয়। বুলু শুয়ে-শুয়ে দরখাস্তের খসড়া ভাবতে লাগল—

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ,

সবিনয় নিবেদন আমার পায়ে একটি কাঁটা ফুটিয়াছিল। পরবর্তীতে সেই কাঁটার কারণে কিংবা অন্য কোনো জটিলতার কারণে পা ফুলিয়া কোলবালিশ হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনাদের হাসপাতালে যদি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ভর্তি করিয়া আমার পায়ের একটা গতি করেন তাহা হইলে বড়ই আনন্দিত হইব।

অসুখের সময়টা বেশ অদ্ভুত। আজে-বাজে জিনিস নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে। বুলু শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন কায়দায় হাসপাতালের চিঠি নিয়ে ভাবতে লাগল। চলিত ভাষায়, সাধু ভাষায়, বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে আবার বেশ রসিকতা করে। রসিকতার চিঠিটা ভালো আসছে না। শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে রস করা বেশ কষ্ট। তবু বুলু প্রাণপণ চেষ্টা করছে,

হাসপাতালের প্রিয় ভাইয়া,

ভাইজান আপনি কেমন আছেন? আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে ভাইজান। সংস্কৃতে যাকে বলে কন্টক। আচ্ছা ভাইজান এই কাঁটাটা কী তোলা যায়? কাঁটা তুলতে হয় কাঁটা দিয়ে। আপনাদের কাছে কি কাঁটা আছে?

বীণা ঘরে ঢুকল। কোমল গলায় বলল, 'দাদা ঘুমুচ্ছ নাকি?'

'না।'

'দুধ এনেছি তোমার জন্যে।'

'দুধ খাবনারে।'

বীণা ভাইয়ের মাথায় হাত রাখল। গায়ে অনেক জ্বর তবু সে কোমল গলায় বলল, 'জ্বর তো নেই।'

বুলু বলল, 'নেই তবে আসব আসব করছে।'

বীণা ভাইয়ের পাশে বসল। তার ভাব-ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চায়।

বুলু বলল, 'কিছু বলবি?'

'না।'

'তাহলে বসে থাকিস না। তোকে দেখে বিরক্তি লাগছে।'

বীণা বসেই রইল।

বুলু বলল, 'যদি কিছু বলার থাকে বলে চলে যা বীণা। এ রকম পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকবি না। চড় মারতে ইচ্ছা করছে।'

'তোমার একটা চিঠি আমার কাছে আছে দাদা। কিন্তু চিঠিটা তোমাকে দিতে ইচ্ছা করছে না।'

'কার চিঠি?'

'অলিকের চিঠি। ওর মাথার ঠিক নেই, কী লিখেছে সে নিজেও বোধ হয় জানে না।'

'তুই চিঠি পড়েছিস?'

'হ্যাঁ। খোলা চিঠি দিয়েছে পড়ব না কেন?'

'আমাকে সেই চিঠি তোর দিতে ইচ্ছে করছে না?'

'না।'

'তাহলে দেয়ার দরকার নেই।'

'ঐ চিঠি পড়লে মেয়েটা সম্পর্কে তোমার ধারণা খারাপ হতে পারে। আমি সেটা চাই না। ও খুব ভালো মেয়ে।'

'ঠিক আছে চিঠি দিতে হবে না।'

'ওর সঙ্গে যদি কোনোদিন তোমার দেখা হয় তাহলে তুমি কিন্তু বলবে চিঠি পেয়েছ।'

'আচ্ছা বলব। এখন তুই দয়া করে বিদেয় হ।'

'বাবা তোমাকে ডাকছেন দাদা।'

'বলিস কি?'

'সন্ধ্যাবেলা তোমার খোঁজ করেছিলেন—তুমি ছিলে না।'

বুলু উঠে বসল। নিচু গলায় বলল, 'বাবা কী করছেন?'

'খাতাপত্র নিয়ে বসেছেন।'

'এখন যাব?'

'যাও।'

'ভয় ভয় লাগছে। ফেল করার পর এখন পর্যন্ত সিরিয়াস কিছু বলেন নি। আজ বোধ হয় বলবেন।'

বীণা কিছু বলল না। বুলু বলল, 'আমি কী বলব বল তো?'

বীণা বলল, 'তুমি কিছুই বলবে না। চুপচাপ শুনবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাবা কিছুই বলবেন না।'

মিজান সাহেব তাঁর ঘরে। বিছানায় কাগজপত্র ছড়িয়ে বসেছেন। তাঁর হাতে একটা ক্যালকুলেটর। বুলুকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। বুলু বলল, 'আমাকে ডেকেছিলেন?'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না। এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন ছেলেকে চিনতে পারছেন না। তারপর চোখ নামিয়ে ক্যালকুলেটরের ফিগার দেখে কাগজে লিখলেন। আবার কয়েকটা সংখ্যা টিপলেন। বুলুর ধারণা হল বাবা তার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে

এখন আর আগ্রহী নন। সে চলে যাবে, না আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে বুঝতে পারছে না। তার কাশি আসছে অথচ কাশতে সাহস হচ্ছে না। কাশি চাপতে গিয়েও পুরোপুরি চাপতে পারল না। সামান্য শব্দ হল। মিজান সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। ভারী গলায় বললেন, 'কী করবে কিছু ঠিক করেছ?'

বুলু জবাব দিল না।

'আবার পরীক্ষা দেবে?'

'জ্বি।'

'গাধারাই চারবার বি.এ পরীক্ষা দেয়। তারপর অভ্যাস হয়ে যায়। অভ্যাস হয়ে যাবার পর প্রতিবার একবার করে দেয়।'

বুলু চুপ করে রইল।

মিজান সাহেব বললেন, 'তুমি একটা গাধা। তোমাকে দেখে যে কেউ একটা গাধার রচনা লিখতে পারে। মুখ ভর্তি দাড়ি কেন? গাধার মুখে দাড়ি কখনো দেখেছ?'

মিজান সাহেব তুমি তুমি করে বলছেন। প্রচণ্ড রাগের সময় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তিনি তুমি তুমি করে বলেন।

'কাল সাড়ে বারটার সময় তুমি আমার অফিসে আসবে। মনে থাকবে?'

'জ্বি।'

'মুখ পরিষ্কার করে আসবে। বাংলাদেশে নাপিতের এখনো অভাব হয় নি। এখন আমার সামনে থেকে যাও।'

বুলু চলে যাবার পর-পর মিজান সাহেব বীণাকে ডেকে পাঠালেন। বীণার সঙ্গে তিনি খানিকটা ভদ্র ব্যবহার করলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'বস। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছ?'

বীণা বলল, 'জ্বি।'

সে মনে মনে ঘামতে লাগল। বাবা তার সঙ্গেও তুমি তুমি করে কথা বলছেন।

'তুমি কি এম. এ পড়তে চাও?'

'জ্বি।'

'কেন চাও?'

বীণা জবাব দিল না। মিজান সাহেব বললেন, 'এম.এ কেন পড়তে চাও সেটা শুনি।'

'আপনি যদি পড়তে নিষেধ করেন পড়ব না।'

মিজান সাহেব বললেন, 'তোমরা আমাকে কী ভাব বল তো? আমি তোমাকে পড়তে নিষেধ করব কেন?'

বীণা দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলছে না।

মিজান সাহেব জবাবের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, 'তোমাকে একটা ঘড়ি দিয়েছিলাম। প্রথম কিছুদিন সারাক্ষণ হাতে থাকত। এখন একবারও দেখি না। যাও ঘড়িটা নিয়ে আস।'

বীণা নড়ল না। আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

'ঘড়িটা কী তোমার সঙ্গে নেই?'

'না।'

'কি করেছ, হারিয়ে ফেলেছ?'

'জ্বি।'

'না, ঘড়ি তুমি হারাও নি। রাগ করে ফেলে দিয়েছ, কি, আমি ঠিক বলছি না?'

বীণা উত্তর দিল না।

মিজান সাহেব বললেন, 'আচ্ছা তুমি যাও।'

তিনি মেয়েকে ডেকেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। বীণার একটা ভালো বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে এই নিয়ে আলাপ করতে চেয়েছিলেন করতে পারলেন না। লজ্জা লাগল। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহজ নয়। বীণার মার সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করা দরকার। আলাপ করতে ইচ্ছা করছে না। মূর্খ মেয়েছেলে। এদের সাথে আলাপ করা না করা সমান। কিছু বললে চারদিকে ঢাক পিটাতে থাকবে। তবু তিনি রাতে শোবার সময় বললেন, 'বীণার একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে।'

ফরিদা সঙ্গে-সঙ্গে বিছানায় উঠে বসলেন। আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'ছেলে কী করে?'

'ডাক্তার।'

'ডাক্তার ছেলে? বল কি? ডাক্তার ছেলে তো খুব ভালো। প্রাকটিস কেমন? রুগী পত্তর পায় তো?'

মিজান সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করলেন। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে তার আর ভালো লাগছে না। ফরিদা বললেন, 'ছেলে দেখেছ তুমি?'

'হুঁ।'

'দেখতে কেমন?'

তিনি জবাব দিলেন না। ফরিদা আবার ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'ছেলে দেখতে কেমন?'

মিজান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'দেখতে ভালো। এখন বিরক্ত করো না তো, ঘুমাও।'

ফরিদা সারা রাত ঘুমুতে পারলেন না। অল্পতেই তাঁর মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়। আজও হয়েছে।

১০

গনি সাহেব বললেন, 'কী মিজান সাহেব, আপনাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?'

'জ্বি না।'

'শরীর খারাপ হলে বাসায় চলে যান। সবারই বিশ্রাম দরকার।'

মিজান সাহেব বললেন, 'আমার স্যার শরীর ঠিক আছে।'

'তাহলে কি মন খারাপ? মন খারাপ হবার তো কোনো কারণ নেই, ছেলে ফিরে এসেছে।'

মিজান সাহেব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'আমি স্যার গতকাল রহমানের বাসায়

গিয়েছিলাম। কথা বলেছি।'

'বাচ্চাটা ভালো?'

'জ্বি ভালো।'

'আর বাচ্চার মা?'

'সেও ভালো। স্যার আমার ধারণা হিসাবের গণ্ডগোলের সঙ্গে রহমানের কোনো সম্পর্ক নেই।'

গনি সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। পরক্ষণেই তা স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি হাসি মুখে বললেন, 'আপনি কি সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করলেন নাকি?'

'জ্বি না। তবে তারা টাকাটা কী করে জোগাড় করেছে এটা শুনলাম। খুব কষ্ট করে টাকা জোগাড় করেছে। জমি জমা, ঘর সব বিক্রি করে একটা বিশ্রী অবস্থা।'

'আহা বলেন কী!'

'আমার খুব খারাপ লাগল।'

'খারাপ লাগারই কথা।'

গনি সাহেব পান মুখে দিতে দিতে বললেন, 'তাহলে আপনার কী ধারণা? টাকাটা গেল কোথায়? আমার কাছে টাকার পরিমাণ খুবই নগণ্য। ওটা কিছুই না কিন্তু এ রকম একটা ব্যাপার তো হতে দেয়া যায় না, তাই না?'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন। গনি সাহেব বললেন, 'ব্যাপারটা ঘটেছে ক্যাশ সেকসনে তাই না?'

'জ্বি।'

'রহস্য উদ্ধার হওয়া দরকার। তা নইলে ভবিষ্যতে যে আরো বড় কিছু হবে না তার গ্যারান্টি কি? তাই না?'

'জ্বি।'

'পুলিশের হাতে ব্যাপারটা দিয়ে দিলে কেমন হয় বলুন তো? পুলিশ কিছু করতে পারবে না জানা কথা। কখনো পারে না, তবু পুলিশ যদি নাড়াচাড়া করে তাহলে সবাই একটু ভয় পাবে। কি, ঠিক বলছি না?'

মিজান সাহেব কিছু বললেন না।

গনি সাহেব বললেন, 'আমার চিটাগাং ব্রাঞ্চের একটা খবর আপনাকে বলি। ফরেন কারেন্সিতে এগার লাখ টাকার একটা সমস্যা। আমার সবচে বিশ্বাসী যে মানুষটা চিটাগাং-এ আছে তাকেই সন্দেহ করতে হচ্ছে। বুঝতে পারছেন অবস্থাটা?'

মিজান সাহেব বললেন, 'আমার ওপর কি আপনার কোনো সন্দেহ হয়?'

'কারো ওপর আমার সন্দেহ হয় না। আবার কাউকে বিশ্বাসও করতে পারি না। বিশ্বাস করা উচিতও না। আদমের উপর আল্লাহ বিশ্বাস করেছিলেন। সেই বিশ্বাসের ফলটা কি হল বলুন? আদম গন্ধম ফল খায় নি? খেয়েছে। মিয়া বিবি দু'জনে মিলেই খেয়েছে। চা খান। চা দিতে বলি। বুঝলেন মিজান সাহেব, যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ সেকসান হল তার হার্ট। হার্টের ছোট অসুখ ধরা পড়ে না। কিন্তু এই ছোট জিনিস হঠাৎ বড় হয়ে যেতে পারে। যখন হয় ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যায়। কেউ বুঝতেও পারে না। ঠিক কি না, বলুন? নির্বোধ মানুষরা সাধারণত সৎ হয়। এই জন্যে ক্যাশে দরকার নির্বোধ ধরনের লোক। মুশকিল হচ্ছে কি, এই নির্বোধ ধরনের

লোকদের আবার অন্যরা সহজেই ব্যবহার করে। কাজেই নির্বোধ ধরনের লোক ক্যাশে অচল। সমস্যাটা দেখতে পারছেন? ভীষণ সমস্যা।'

চা এসে গেছে। মিজান সাহেব চায়ে এক চুমুক দিয়েই কাপ নামিয়ে রাখলেন। ঠাণ্ডা গলায় আবার বললেন, 'আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

গনি সাহেব বললেন, 'না করছি না। আপনি আমার অতি বিশ্বাসী লোকদের এক জন। এই বৎসর থেকে আপনার বেতন পাঁচশ টাকা বাড়ানো হয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যে চিঠি পাবেন। তবে মিজান সাহেব, ঐ যে বললাম, বাবা আদমের কাহিনী। চা খান। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

মিজান সাহেব চা খেতে পারলেন না। তাঁর বমি বমি লাগছে।

গনি সাহেব বারটার দিকে রোজ একবার বাসায় টেলিফোন করে তাঁর ছেলের খোঁজ নেন। আজও টেলিফোন করলেন। তাঁর স্ত্রী সম্ভবত টেলিফোনের কাছেই বসে থাকেন, কারণ একবার রিং হওয়া মাত্র টেলিফোন তুলে তিনি চিকন গলায় বলেন, 'আপনি কে বলছেন?'

আজ বেশ কয়েকবার রিং হবার পর তিনি টেলিফোন ধরলেন এবং যথারীতি বললেন, 'আপনি কে বলছেন?'

গনি সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'বাবু কোথায়?'

'বাসায় নাই।'

'বাসায় নাই মানে? কী বলছ এসব।'

'বড় জামাই নিয়া গেছে।'

'বড় জামাই নিয়ে গেছে মানে! এর মানে কি? কোথায় নিয়ে গেছে?'

'ফরিদপুর।'

গনি সাহেবের মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ব্যাপারটা কি দ্রুত আঁচ করতে চেষ্টা করলেন। তেমন কিছু ধরতে পারলেন না। তাঁর কপালে ঘাম জমল। তিনি থমথমে গলায় বললেন,

'ফরিদপুর নিয়ে গেছে কেন?'

'ঐখানে এক পীর সাহেব আছেন, পীর সাহেব দোয়া পড়লে সব ভালো হয়।'

'আমি বলি নি যে, জামাইয়ের সঙ্গে বাবু কোথাও যাবে না? বলি নি?'

'এখন নিতে চাইলে আমি না করি ক্যামনে? জামাই মানুষ।'

'কখন নিয়ে গেছে?'

'সকালে। আপনি বাইরে যাওয়ার একটু পরে।'

'আমাকে এতক্ষণ বল নি কেন? কেন তোমার এত সাহস হল? কোত্থেকে এত সাহস পেলে?'

ও পাশে ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছে। গনি সাহেবের স্ত্রী কাঁদতে শুরু করেছেন। এই কান্না অবশ্যি খুব সাময়িক। টেলিফোন রেখে দেয়া মাত্র কান্না থেমে যাবে।

গনি সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি তাঁর জামাইদের বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা বাবুকে বড় জামাই একা নিয়ে যায় নি। তিন জনই এর সঙ্গে আছে। এই নিয়ে যাবার পেছনে দীর্ঘ পরিকল্পনা থাকা বিচিত্র না। হয়ত বিকেলে বড় জামাই ফিরে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলবে—একটা সর্বনাশ হয়েছে। বাবু পুকুরে পড়ে গেছে।

কিংবা বলবে—বাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সিগারেট কিনবার জন্যে গিয়েছি—বাবু দাঁড়িয়েছিল—ফিরে এসে দেখি......

যদি এ রকম কিছু হয় তিনি কী করবেন? তিন জামাইয়ের বিরুদ্ধে পুলিশ কেইস করবেন? জামাইদের হাতকড়া বেঁধে নিয়ে যাবে—তিনি দেখবেন? পত্রিকায় ছবি ছাপা হবে। বাবু হত্যা রহস্য। অবশ্যি পত্রিকার লোক এটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। কোনো সুন্দরী মেয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত না থাকলে খবরের কাগজের লোকজন উৎসাহ পায় না। বাবু হত্যায় কেউ কোনো উৎসাহ পাবে না। অপ্রকৃতিস্থ একটা শিশুর হত্যায় কিছুই যায় আসে না। খবরের কাগজের ভেতরের দিকের পাতায় খবরটা ছাপা হতে পারে। কিংবা হয়ত ছাপাই হবে না। রোজ কত হত্যাকাণ্ড ঘটছে। হত্যার খবরে মানুষের এখন আর আগ্রহ নেই।

গনি সাহেব তার দ্বিতীয় জামাই এবং ছোট জামাইকে টেলিফোন করলেন। তিনি জানতে চান তারা ঢাকাতেই আছে না ফরিদপুর গেছে। দু'জনকেই পাওয়া গেল। শ্বশুরের টেলিফোন পেয়ে তারা গরমের দিনের মাখনের মতো গলে গেল। প্রতিটি বাক্যে তিনবার করে বলছে, 'আব্বা, আব্বা, আব্বা।'

গনি সাহেব মনে মনে বললেন, 'ফাজিলের দল, নিজের বাবাকে দিনে ক'বার আব্বা ডাকিস? ক'বার জিজ্ঞেস করিস—আব্বা আপনার শরীরটা এখন কেমন?'

গনি সাহেব শান্ত ভঙ্গিতে দু'জামাইয়ের সঙ্গেই কথা বললেন। কথার মধ্যে বাবু বা বড় জামাইয়ের প্রসঙ্গ একবারও এল না।

তিনি দুপুরে বাসায় খেতে যান।

আজ গেলেন না।

চুপচাপ বসে রইলেন। কিছুই ভালো লাগছে না।

একবার ভাবলেন মিজান সাহেবকে ডেকে খানিকক্ষণ গল্প করবেন। এই চিন্তা বাদ দিলেন। এখন টিফিনের সময়। এই সময়ে ক্ষুধার্ত এক জন মানুষকে বসিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া মানুষটা একটা ধাক্কা খেয়েছে। ধাক্কা সামলানোর সুযোগ দেয়া দরকার। ধাক্কাটা তিনি ইচ্ছা করেই দিয়েছেন। এর দরকার আছে। মনের ভেতর একটা ভয় থাকুক, ভয় মানুষকে বেঁধে রাখে।

পুলিশের খবর দেবার কথাটা তিনি এমনি বলেছেন। পুলিশের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে তিনি যেতে চান না। পুলিশ মানেই ঝামেলা। যদিও ঝামেলার প্রয়োজন আছে।

তবে তিনি কাজ করবেন তাঁর মতো। তিনি বুঝিয়ে দেবেন যে তিনি একই সঙ্গে সন্দেহ করেন আবার ভালোও বাসেন। পাঁচ শ' টাকা বেতন বেড়ে যাচ্ছে এই বাজারে এটা কম কথা না। তাছাড়া তিনি মিজান সাহেবের ফেল করা ছেলেটাকেও চাকরি দেবেন। অবশ্যই দেবেন। বংশ পরম্পরায় কৃতজ্ঞতার জালে বেঁধে রাখবেন। ব্যবসা বড় হচ্ছে এই সময়ে বিশ্বাসী লোক দরকার। একদল বিশ্বাসী লোক তাঁর সঙ্গে থাকবে অথচ তারা জানবে তারা পুরোপুরি বিশ্বাসী নয়।

চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের ব্যাপারে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। বার লাখ টাকার কোনো ব্যাপার না। সেখানেও লাখ খানিক টাকার গণ্ডগোল। এটা খারাপ না। এটা ভালো। সবাই জানবে এত টাকার একটা সমস্যা আছে। তারা আরো সাবধান হবে। তবু কিছু গোলমাল বৎসর দুই পর-পর দেখা দেবে।

গনি সাহেব মাথা খেলিয়ে এই পদ্ধতি বের করেছেন। এই পদ্ধতি বের করতে তাকে অনেক মাথা খেলাতে হয়েছে। এই পদ্ধতিও হয়ত সঠিক না। এর মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। সব পদ্ধতিতেই আছে।

এই পদ্ধতির পুরোটা তাঁর নিজের না খানিকটা মুনিরের কাছে শিখেছেন। মুনির এই বয়সেই বিশাল কনস্ট্রাকশান ফার্মের মালিক। সে একদিন বলেছিল, 'হিসাবে একুশ লক্ষ টাকার একটা গণ্ডগোল করে রেখেছি। নিজেই করেছি। এতে লাভ কী হয়েছে জানেন, গনি সাহেব? লাভ একটাই হয়েছে—আমার সব ক'টা লোক সুঁচের আগায় বসে আছে। হা হা হা। সবাই ভাবছে যে-কোনো মুহূর্তে চাকরি চলে যেতে পারে। অথচ যাচ্ছে না। এতে কাজ হয়। ভালো কাজ হয়। আপনি আমার বন্ধু মানুষ। আপনি টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন বলে এত দূর উঠতে পেরেছি। আপনাকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিলাম। সব সময় হিসাবের একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে রাখবেন। তারপর দেখবেন সব কেমন ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। টিক টিক। টিক টিক।'

গনি সাহেব আবার মিজান সাহেবকে ডেকে পাঠালেন, মধুর স্বরে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে মিজান সাহেব?'

'জ্বি।'

'বসুন বসুন।'

তিনি বসলেন।

গনি সাহেব বললেন, 'দেশের জন্যে কিছু কাজ করতে চাই। কী ভাবে তা করা যায় কিছু ভেবেছেন?'

'জ্বি না।'

'ভাবুন। ভেবে বের করুন। আর আপনার ছেলেকে নিয়ে আসতে বলেছিলাম না? আনছেন না কেন?'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন।

'আজই তো আনার কথা তাই না?'

'জ্বি।'

'যদি আসে সরাসরি আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কম্প্যুটার সেকশনে দিয়ে দেব। ভালোমতো ট্রেনিং নিক। কম্প্যুটার কোম্পানি ট্রেনিং দিয়ে দেবে। কোনো অসুবিধা নেই। আপনার শরীরটা কি খারাপ নাকি?'

''জ্বি খারাপ।'

'যান, বাসায় চলে যান। বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন।'

মিজান সাহেব চলে যাবার পর পরই গনি সাহেব টেলিফোন পেলেন—বড় জামাই বাবুকে নিয়ে ফিরেছে। অনেক দিন পর বাইরে ঘুরতে পেরে বাবু খুব খুশি। পীর সাহেব তাকে একটা কবচ দিয়েছেন। জাফরান দিয়ে কোরানের আয়াত লেখা একটা প্লেট দিয়েছেন। সেই প্লেট ধোয়া পানি প্রতি বুধবার খালি পেটে খেতে হবে।

তিনি মনে মনে বললেন—হারামজাদা। গালিটা কাকে দিলেন তিনি নিজেও বুঝলেন না। নিজের জামাইদের না পীর সাহেবকে? নাকি পৃথিবীর সব মানুষদের?

তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব কখনো ফোটে না। আজ ফুটেছে। তিনি টেলিফোন নামিয়ে রেখে ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ ভাবলেন তারপর টেলিফোন করলেন রমনা থানায়।

রমনা থানার ও সি বিগলিত গলায় বলল, 'কেমন আছেন স্যার?'

'ভালো। আপনার শরীর কেমন?'

'জ্বি আপনার দোয়া। কিছু করতে হবে?'

'জ্বি না। একটু ভয় দেখানোর দরকার হয়ে পড়ল যে ও সি সাহেব।'

'ভয় দেখানোর দরকার হলে দেখাব। হাজতে এনে প্যাঁদানি দিয়ে দেব। ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কিছুই না। ক্যাশের টাকা–পয়সার ব্যাপারে একটা ঝামেলা হয়েছে। কয়েকজনকে একটু ভয় দেখানো।'

'কোনো অসুবিধা নেই। আপনি একটা এফ আই আর করে রাখুন। তার পর দেখুন কি করছি।'

'না না তেমন কিছু করতে হবে না। ভদ্রভাবে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এতেই কাজ হবে।'

১১

বারটার সময় বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা। বুলু যেতে পারে নি। সকাল থেকেই তার গা আগুনে গরম। পায়ে অসহ্য ব্যথা। পায়ের নিচটা কেমন নীল হয়ে গেছে।

বীণা চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে একটা ধাক্কা খেল। গোঙানীর শব্দ হচ্ছে। বুলুর মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। চোখ ঘোর রক্তবর্ণ। বীণা বলল, 'কি ব্যাপার দাদা?' বুলু বলল, 'একটা কুড়াল নিয়ে আয়। কুড়াল দিয়ে কোপ দিয়ে পা–টা কেটে ফেলে দে।'

বীণা ভাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাবা অফিসে চলে যাবার পর বুলু শব্দ করে কাঁদতে লাগল। পাড়ার ডাক্তার এসে বলল, 'এখনো হাসপাতালে ভর্তি করেন নি? কী আশ্চর্য! আপনারা এত ক্যালাস কেন? এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যান।'

বুলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'নিয়ে গেলেই হাসপাতালে ভর্তি করবে?'

'চেষ্টা চরিত্র করবেন। আপনাদের চেনা জানা কেউ নেই? দেরি করা উচিত হবে না। আমার মনে হয় গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে।'

বীণা একবার ভাবল বাবাকে অফিসে খবর দেবে। শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলাল না। নিজেই বুলুকে নিয়ে রওনা হল। ফরিদা ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। বীণার দাদী চেঁচাতে লাগলেন—'কে কান্দে রে? বড় বউ না? বড় বউ ক্যান্দে ক্যান? ও বড় বউ?'

লীনা অসম্ভব ভয় পেয়েছে। বাবলুও ভয় পেয়েছে, তবে সে খানিকটা আনন্দিত। কারণ আজ স্কুলে যেতে হবে না। স্কুল তার একেবারেই ভালো লাগে না।

বীণা হাসপাতালে কিছুই করতে পারল না। এখানকার মানুষজন মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে–দেখে পাথরের মতো হয়ে গেছে। একটা বয়স্ক ছেলে যে শিশুর মতো চেঁচাচ্ছে

তার জন্যে কারো মনে মমতার ছায়া পড়ছে না। শুধু এক জন অল্প বয়স্ক ডাক্তার বীণাকে নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করল। একসময় বলল, 'আপনি কাঁদবেন না। একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

সেই ছেলেও কিছু করতে পারল না। এক সময় লজ্জিত গলায় বলল, 'আপনার পরিচিত বড় কেউ নেই?'

বীণা চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'না।' বলেই তার অলিকের কথা মনে পড়ল। ধরা গলায় বলল, 'আমি কি একটা টেলিফোন করতে পারব?'

'অবশ্যই পারবেন। আপনি কাঁদবেন না প্লিজ, কাঁদবেন না।'

অলিককে পাওয়া গেল। অলিক বলল, 'ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে ঠাণ্ডা গলায় বল।'

বোরহান সাহেব মিটিং-এ ছিলেন।

ছোটখাটো মিটিং না, বড় মিটিং। স্বয়ং মন্ত্রী মিটিং চালাচ্ছেন। এর মধ্যেই বোরহান সাহেবকে বলা হল—বাসা থেকে তাঁর মেয়ে টেলিফোন করেছে। অসম্ভব জরুরি। এক সেকেন্ডও দেরি করা যাবে না। বোরহান সাহেব শুকনো মুখে উঠে দাঁড়ালেন, মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার আমাকে তিন মিনিটের জন্যে একটু ছাড়তে হবে। বাসায় বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে। আমি তিন মিনিটের মধ্যে আসছি। আমি খুবই লজ্জিত।'

মন্ত্রী অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলেন। বললেন, 'আপনাকে ১৫ মিনিট সময় দেয়া হল। এর মধ্যে আমরা একটা টি-ব্রেক নেব। আপনি চা মিস করলেন।'

বোরহান সাহেব টেলিফোন ধরা মাত্র অলিক বলল, 'কেমন আছ বাবা?'

বোরহান সাহেব বললেন, 'এইটাই কি তোমার জরুরি খবর?'

'হ্যাঁ। তুমি কি ভালো আছ বাবা?'

রাগ করতে গিয়েও তিনি রাগ করলেন না। নরম গলায় বললেন, 'আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?'

'ভালো না। আমার মনটা খুব খারাপ। খুবই খারাপ।'

'কেন মা?'

'আমার বন্ধুর ভাই হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছে না। হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাঁদছে।'

'দেশের অবস্থাই তো এরকম মা। হাসপাতালে সিট নেই, ঘরে খাবার নেই, অফিসে চাকরি নেই।'

'বাবা।'

'বল মা।'

'তুমি এক ঘন্টার মধ্যে এই ছেলেটার হাসপাতালে ভর্তি করার একটা ব্যবস্থা করবে।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ করবে।'

'কি করে করব বল তো? তুই কী ভাবিস আমাকে?'

'এক মিনিট কিন্তু চলে গেছে বাবা। আর মাত্র ৫৯ মিনিট আছে।'

'তুই বড় পাগলামি করিস মা।'

'বেশি দিন তো করব না বাবা। আর খুব অল্পদিন করব। তারপর আর করব না। ইচ্ছা থাকলেও করতে পারব না।'

বোরহান সাহেব বললেন, 'আমি ব্যবস্থা করছি।'

বাহান্ন মিনিটের মাথায় বুলু ভর্তি হয়ে গেল। দেড় ঘন্টার মধ্যে দু'জন বড় বড় ডাক্তার বুলুকে দেখতে এলেন।

বুলুর পাশের বেডে সবুজ শার্ট গায়ে দাড়িওয়ালা এক জন মানুষ। সে আগ্রহ নিয়ে বলল, 'ভাইজান আফনের পরিচয়?'

১২

অলিক আজ চমৎকার একটা নীল শাড়ি পরেছে। সেজেছেও খুব যত্ন করে। তাকে জলপরীর মতো লাগছে। ডারমাটোলজিস্ট প্রফেসর বড়ুয়া বললেন, 'কেমন আছ মা?'

অলিক বলল, 'আমি ভালো আছি। আপনি সাত দিন পর আসতে বলেছিলেন, আমি এসেছি।'

'দেখি, তোমার দাগের কি অবস্থা।'

'দেখুন।'

প্রফেসর বড়ুয়া দেখলেন। দাগ আরো বেড়েছে। কিছু কিছু দাগ ফ্যাকাশে হলুদ থেকে কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি অবাক হয়ে দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অলিক বলল, 'আপনি ওষুধ বদলে এখন নতুন ওষুধ দেবেন, তাই না? আমার মার ডাক্তারও তাই করতেন।'

প্রফেসর বড়ুয়া কিছু বললেন না।

বোরহান সাহেব বললেন, 'মেয়েটিকে কি বাইরে নিয়ে যাব?'

প্রফেসর বড়ুয়া দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'নিয়ে যান।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়েই বোরহান সাহেব বললেন, 'তোর বান্ধবীর ভাইকে দেখতে যাবি নাকি?'

'না।'

'না কেন? চল দেখে আসি।'

'হাসপাতাল আমার ভালো লাগে না বাবা।'

'বাসায় চলে যাবি?'

'হুঁ। আমার কাজ আছে।'

'কি কাজ?'

'খুব জরুরি একটা কাজ।'

অলিকের কাজটা তেমন কিছু জরুরি না। ওডেনের একটা কবিতার ছায়ায় গত চারদিন ধরে সে নিজে একটা লিখতে চেষ্টা করছে। ওডেনের সেই সহজ ভঙ্গি তার

কবিতায় আসছে না। কবিতাটা কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সহজ করে লেখা এত কঠিন কেন তাই সে বুঝতে পারছে না।

বাসায় ফেরার পথে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে সে মনে–মনে কবিতাটা আবৃত্তি করল।

He was fully sensible to the advantage of the installment plan.

And had everything necessary to the Modern Man.

A gramophone, a radio, a car a frigidare.

আচ্ছা এই মানুষটি কি সুখী ছিল?

যার জীবনের কোনো সাধই অপূর্ণ নয় সেকি সুখী? জীবনানন্দ দাশের লাশকাটা ঘরের ঐ মানুষটিও কি সুখী ছিল? ঐ মানুষটির স্ত্রী ছিল, শিশু ছিল, ভালবাসা ছিল। তবু তাকে লাশ কাটা ঘরে যেতে হল কেন? মনে হয় জীবনানন্দ দাশের ঐ মানুষটি সুখী ছিল তাহলে ওডেনের মানুষটি সুখী ছিল কি? ওডেনের ঐ মানুষটির তো কোনো অভাব ছিল না। তার একটা গাড়ি ছিল, একটা গ্রামোফোন ছিল, একটা ফ্রিজ ছিল।

১৩

মিজান সাহেব ফরিদাকে বিয়ের কথা ভেঙে কিছুই বলেন নি।

তবু ফরিদা সবই জেনে গেলেন। ছেলের এক ফুপু এসে সব রহস্য ফাঁক করে দিলেন। ছেলে দেশে থাকে না—থাকে নিউ অরলিন্সে। ডাক্তারী পাশ করেছে জন সেন্ট লুক থেকে। বয়স একত্রিশ। আমেরিকার রেসিডেন্সশিপ গত বছর পেয়েছে। সে বড় হয়েছে আমেরিকাতে। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হিসেবে আমেরিকায় গিয়েছিল পনের বছর বয়সে, এর মধ্যে দেশে আসে নি। এখন তিন মাসের জন্যে এসেছে। বিয়ে করে চলে যাবে। বউ মাস তিনেক পর যাবে। ভিসা টিসা ঠিক করতে এই সময়টা লেগে যাবে।

ছেলের ফুপু নিজেও ডাক্তার। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে কাজ করেন। ডাক্তার হয়ে যাওয়া মেয়েদের কথাবার্তা খানিকটা রুক্ষ ধরনের হয়। এই ভদ্রমহিলার তা না। তিনি বেশ মজা করে কথা বলছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর হাসছেন। তিনি বললেন, 'তৌফিককে পাঠিয়ে দেব। আপনারা কথা বলে দেখুন পছন্দ হয় কিনা। কখন পাঠাব বলে দেবেন। আমরা আপনাদের খুব কাছেই থাকি। বাড়ির নাম 'পদ্মসখা' হলুদ রঙা তিনতলা বাড়ি। দেখেছেন না?'

ফরিদা সেই বাড়ি দেখেন নি তবু মাথা নাড়লেন যেন দেখেছে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমাদের ছেলে কিন্তু আপনার মেয়েকে দেখেছে। ওদের মধ্যে কি সব কথাও নাকি হয়েছে। ছেলে খুবই ইমপ্রেসড। পরে যখন খোঁজ নিয়ে জানা গেল আপনার মেয়ে ছাত্রী হিসেবেও খুব ভালো তখন সে আরো ইমপ্রেসড হল। এখন বলুন ছেলেকে কখন পাঠাব?'

ফরিদা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। বুলুর বাবার সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করা যাবে না। এখন অবস্থা এমন যে বুলুর বাবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। অফিস থেকে বাসায় এসে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে হাসপাতালে যায়। সারা রাত থাকে হাসপাতালে। বুলুর অবস্থা নাকি ভালো না। কেন ভালো না তা ফরিদা ঠিক বুঝতে পারেন না। তিনি একবার হাসপাতালে বুলুকে দেখতে গেলেন, সে তো বেশ অনেক কথা টথা বলল। বুলু সুস্থ থাকলে বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে নেয়া যেত। অসুস্থ হয়ে হয়েছে যন্ত্রণা।

মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা হলে মেয়ের মায়েদের মনে তীব্র আনন্দ হয়। ফরিদারও হচ্ছে। তাঁর বুকের ব্যথা পর্যন্ত এখন হয় না। শুধু একটিই কষ্ট—বীণার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গেই কথা বলতে পারছেন না। অথচ কথা বলতে ইচ্ছা করে। কথা যা বলার বীণার সঙ্গেই বলেন। বীণা লজ্জা পায় তবে চুপ করে থাকে না, মার কথার জবাব দেয়। ফরিদার ধারণা বীণাকে বাইরে থেকে যতটা লাজুক মনে হয় ততটা লাজুক সে না। লাজুক হলে আগ বাড়িয়ে কোনো মেয়ে কি যুবক একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলে?

ছেলের ফুপু যখন বললেন, ওদের দু'জনের কথা হয়েছে তখনই ফরিদার মনে সামান্য সন্দেহ ঢুকেছিল এই ভদ্রমহিলা হয়ত অন্য কোনো মেয়ের কথা বলছেন। ছেলের ফুপু চলে যাবার পর পরই বীণাকে তিনি বললেন, 'সে কোনো ছেলের সঙ্গে কথা-টথা বলেছে কি না। তৌফিক নাম। বিদেশে থাকে।'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ।' ফরিদা বললেন, 'কেন গায়ে পড়ে কথা বললি?'

'উনি আমাদের বাসার সামনে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি শুধু বললাম, 'আপনি কী চান? উনি তখন হড়বড় করে এক গাদা কথা বললেন। কেন মা?'

ফরিদা হাসি মুখে বললেন, 'এই ছেলে তোকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। ছেলেটা কেমন বল তো? তোর কি পছন্দ হয়?'

বীণা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ফরিদা বললেন, 'মুখটা এমন শুকনো করে দিলি কেন? বয়স হয়েছে বিয়ে করবি না? পরের সংসারে কতদিন আর থাকবি? এখন নিজের সংসার হবে।' বীণা থমথমে গলায় বলল, 'এটা পরের সংসার?'

'পরের সংসার না তো কি? মেয়েদের নিজের সংসার একটাই, স্বামীর সংসার।'

বীণা কোনো কথা না বলে উঠে গেল। তবে ফরিদার মনে হল বিয়ের এই আলাপে বীণার তেমন আপত্তি নেই। ছেলেটিকে তার বোধ হয় পছন্দই হয়েছে।

ফরিদার অনুমান খুব ভুল হয় নি। ছেলেটিকে বীণার পছন্দ হয়েছে। বীণার মনে হয়েছে—ছেলেটা ভালো। কেন এরকম মনে হল সে সম্পর্কে বীণার কোনো ধারণা নেই। প্রবাসী মানুষদের মধ্যে আলগা ধরনের যে স্মার্টনেস থাকে এর মধ্যে তা নেই, কেমন যেন ঢিলাঢালা ধরনের। চোখে মোটা কাচের চশমার কারণেই বোধ হয় তার মধ্যে প্রফেসর প্রফেসর ভাব চলে এসেছে। এই ভাবটা বীণার খুব ভালো লাগে। তাদের কলেজের এক জন প্রফেসর অজিত বাবুর চশমার কাঁচ খুব মোটা। তিনি ক্লাসে ঢুকেই বলেন, 'মা জননীরা, তোমরা একটু হাস। তোমাদের হাসি দেখে ক্লাস শুরু করি।' এই অজিত বাবুকে বীণার খুবই ভালো লাগত। সেই ভালো লাগার অংশ বিশেষ মোটা চশমার কারণে তৌফিক ছেলেটা পেয়ে গেল। এক জন মানুষকে ভালো লাগা এবং

মন্দ লাগার পেছনে অনেক বিচিত্র এবং রহস্যময় কারণ থাকে।

তৌফিক ছেলেটির প্রতি ভালোলাগার পরিমাণ আরেকটু বাড়ল দ্বিতীয়বার যখন দেখা হল। বীণা হাসপাতাল থেকে ফিরছে বাড়িতে ঢোকার গলির মাথায় আসতেই দেখা। তৌফিক রাস্তার একপাশে বিব্রতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার প্রথম কথা বলল বীণা। লাজুক গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

তৌফিক বিব্রত স্বরে বলল, 'তেমন কিছু না। গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। দেখুন না কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে কী অবস্থা।'

বীণা দেখল। বাঁ পায়ের প্যান্টে থিকথিক ময়লা লেগে আছে। বীণা বলল, 'বাসায় গিয়ে পা ধুয়ে ফেলুন।'

এই বলেই বীণার মনে হল সে এত কথা বলছে কেন? এত কথা বলার কি আছে? কথা শুরু করে চট করে চলে যাওয়াও যায় না। বীণা কিছুটা অস্বস্তি এবং কিছুটা অনিশ্চয়তায় বাড়ির দিকে পা বাড়াল। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটি তার সঙ্গে-সঙ্গে আসছে। গেটের কাছাকাছি আসার পর বীণার মনে হল তার হয়ত বলা উচিত—ভেতরে আসুন। কথার কথা। ভদ্রতার জন্যেই বলা। মুশকিল হচ্ছে বলার পর সে যদি সত্যি-সত্যি বাড়িতে ঢোকে তখন? সেটা কি ঠিক হবে?

বীণা চোখ মুখ লাল করে বলল, 'ভেতরে আসুন।'

তৌফিক হেসে বাড়িতে ঢুকল। বীণা কী করবে ভেবে পেল না।

বীণার দাদী চেঁচাতে শুরু করলেন—'কে আসল? লোকটা কে? ও বীণা লোকটা কে? কি চায় এই লোক।'

বীণা তৌফিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'আমার দাদী। উনার মাথার ঠিক নেই।'

তৌফিক বলল, 'বাসায় আর কেউ নেই?'

'মা আছেন। আপনি বসুন মাকে ডেকে আনছি।'

ফরিদা মাছ কাটছিলেন। তৌফিক এসেছে শুনে এতই উত্তেজিত হলেন যে বটিতে হাত কেটে ফেললেন।

তৌফিক অনেকক্ষণ এ বাড়িতে রইল। ফরিদার সঙ্গে সহজ ভঙ্গিতে গল্প করল। বীণার দাদীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। নরম গলায় বলল, 'দাদী আপনি কেমন আছেন?'

বীণার দাদী বললেন, 'মর হারামজাদা।'

তৌফিক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শব্দ করে হেসে উঠল। এই সহজ সরল হাসি বড় ভালো লাগল বীণার।

সেইদিন বিকেলেই ছেলের ফুপু এসে বললেন, 'শুনলাম ছেলেকে আপনি দেখেছেন। আপনার কি ছেলে পছন্দ হয়েছে?'

ফরিদা বললেন, 'হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে।'

'আমরা কি বিয়ের তারিখ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারি? আমরা এই মাসেই কিংবা সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাই।'

'বীণার বাবার সঙ্গে কথা বলেন।'

'হ্যাঁ বলব। দু'এক দিনের মধ্যেই বলব। আপনার বড় ছেলেটা শুনলাম অসুস্থ।'

'জ্বি। পায়ে কী যেন হয়েছে।'

'বাড়ির বড় ছেলে অসুস্থ এই অবস্থায় তো বিয়ের আলাপ চলতে পারে না। ও কবে নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে কিছু জানেন?'

'জ্বি না।'

'এখন সে আছে কেমন?'

'একটু ভালো আছে।'

'একদিন যাব দেখতে। আপনার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব যদি 'আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি কিসের। মেয়ে তো এখন আপনাদের।'

ফরিদা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। চোখের পানি সামলাতে তাঁকে খুব কষ্ট করতে হল।

১৪

বুলুর পায়ে গ্যাংগ্রিন ধরা পড়েছে।

দু'বার অপারেশন হল। তৃতীয় বারও সম্ভবত হবে। দু'জন ডাক্তারের এক জন কিছুতেই পা এম্পুট করতে রাজি না। সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে চান। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনীর মতো অবস্থা। এই ডাক্তারটির বয়স অল্প। হৃদয় কঠিন হতে শুরু করে নি। তিনি রাউন্ডে এসে বুলুর বিছানার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ান। বুলুর পা পরীক্ষা করেন। এই সময় গভীর বিরক্তিতে তার মুখ অন্যরকম হয়ে যায়। বুলু বলে, 'আপনি কেমন আছেন স্যার?'

তিনি কঠিন গলায় বলেন, 'ভালো।'

'আমার পা কেমন দেখলেন?'

তিনি জবাব দেন না। বুলু নিচু গলায় বলে, 'কেটে ফেলে দেবেন কবে?'

'সময় হলেই ফেলা হবে। আপনি চুপ করে থাকুন।'

বেশিরভাগ সময় বুলু চুপ করে থাকে। একটা ঘোরের মধ্যে তার সময় কাটে। তন্দ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থা। যে অবস্থায় চারপাশের জগৎটাকে খুবই অবাস্তব মনে হয়। তার পাশের বেডের দাড়িওয়ালা কালো মানুষটাকে এক সময় খুবই পরিচিত মনে হয় আবার পরমুহূর্তেই মনে হয়—দাড়িওয়ালা এই ছাগল কে?

এই লোকটি বুলুকে খুব বিরক্ত করে। অকারণে কথা বলে। বুলুর অসহ্য লাগে—বুলু বিরক্ত হয় এমন কাজগুলো সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে। কাল দুপুরে কট কট শব্দ করে কী যেন খাচ্ছিল। শব্দটা চট করে বুলুর মাথায় ঢুকে গেল। মাথার ভেতর কট কট শব্দ হতে থাকল। বুলুর এই এক সমস্যা হয়েছে যে কোনো শব্দই চট করে মাথায় ঢুকে যায়। তারপর মাথার ভেতর সেই শব্দ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। লোকটা কট কট শব্দে খাচ্ছে সেই শব্দ পাক খাচ্ছে বুলুর মাথায়। বুলু বলল, 'কি খান?'

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নেন ভাইজান খান।'

'না আমি খেতে চাই না। আপনি নিজেই খান, তবে দয়া করে কট কট শব্দ করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

বুলু চোখ বন্ধ করল। যখন ঘুম এসে যাচ্ছে তখন আবার কট কট শব্দ শুরু হল। দাড়িওয়ালা লোকটা খাওয়া শুরু করেছে। বুলু থমথমে গলায় বলল, 'এই যে ভাই আর একবার যদি কট কট শব্দ হয় তাহলে কিন্তু ধাক্কা দিয়ে আপনাকে জানালা দিয়ে ফেলে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

দাড়িওয়ালা এই লোকটির নাম শামসু। একটা লেদ মেশিন চালায়। বুলু যখন কিছুটা ভালো থাকে তখন তার সঙ্গে অনেক কথা টথা বলে। লোকটি প্রতিটি বাক্যে খুব মিষ্টি করে একবার হলেও ভাইজান বলে। বুলুর শুনতে ভালো লাগে। লোকটির বেশিরভাগ কথাই হচ্ছে লেদ মেশিন সংক্রান্ত।

'ভাইজান লেদ মেশিন যন্ত্রটা হইল দুনিয়ার এক "আজিব চিজ"।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি ভাইজান। এই যন্ত্র যে জানে সে দুনিয়ার সবই জানে।'

'আপনি জানেন?'

'নিজের মুখে কি বলব ভাইজান আপনে ধোলাই খালে গিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করবেন—শামসু কারিগর। দেখবেন আফনের কি খাতির।'

'আপনাদের কি কারিগর বলে নাকি?'

'না মিস্তিরি বলে। আমারে খাতির কইরা কারিগর ডাকে। আপনার সঙ্গে যখন খাতির হইল তখন আর চিন্তা নাই। কথা দিলাম আফনেরে কাজ শিখায়ে দিব।'

'আমি কাজ শিখে কী করব?'

'যন্ত্র চালাইবেন। চাকরি-বাকরি দিয়া কি হয় বলেন ভাইজান? কয় পয়সা বেতন? স্বাধীন ব্যবসার মতো জিনিস আছে?'

'আর কথা বলবেন না ভাই। যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে। ভালো লাগছে না।'

'দমে দমে আল্লাহু বলেন ভাইজান।'

'চুপ থাকতে বললাম না।'

'নিঃশ্বাসটা নেওয়ার সময় বলেন আল্লা ছাড়ার সময় বলেন হুঁ। এতে কাজ হয়।'

'চুপ। একটা কথা না। ব্যাটা ছাগল।'

শামসু দুঃখিত চোখে তাকায়। আশ্চর্যের কথা সেই দুঃখী চোখে প্রচুর মমতাও ঝরে পড়ে।

আজ বুলুর পায়ের যন্ত্রণা খুব বেড়েছে।

নার্স এসে কড়া ধরনের কোনো পেইন কিলার দিয়েছে যা তার পায়ের ব্যথা একটুও না কমিয়ে মাথাটাকে কেমন ভোঁতা বানিয়ে দিয়েছে। কানের কাছে পিন পিন শব্দ হচ্ছে। যেন বেশ কিছু মশা দু'কানের ভেতর দিয়ে মাথায় ঢুকে গেছে।

রাত আটটার মতো বাজে। মিজান সাহেব ছেলের বিছানার পাশে বসে আছেন। আজ রাতটা তিনি ছেলের সঙ্গেই কাটাবেন। প্রায়ই কাটান। অফিস থেকে সরাসরি

এখানে চলে আসেন। খুব যেদিন বাড়াবাড়ি দেখেন সেদিন আর বাসায় যান না।

বুলু ডাকল, 'বাবা।'

মিজান সাহেব নড়ে চড়ে বসলেন। কিছু বললেন না। বুলু বলল, 'আমি পাশ না করার জন্য খুব লজ্জিত বাবা। থার্ড পেপারটা এমন খারাপ হল।'

মিজান সাহেব বললেন, 'এটা নিয়ে পরে আলাপ করব।'

'পরীক্ষার হলে খুব নকল হচ্ছিল একবার ভাবলাম—তারপর বাবা মনটা সায় দিল না।'

'এখন এইসব থাক।'

'আমি এতক্ষণ কী ভাবছিলাম জান? ভাবছিলাম যদি নকল করে পরীক্ষায় পাশ করে ফেলতাম তাহলে বাড়ি থেকে পালাতাম না। পায়ে কাঁটা ফুটত না, ডাক্তারেরা পা কেটে বাদ দিত না।'

'পা কাটার কথা এখনি ভাবছিস কেন? ডাক্তাররা তো চেষ্টা করছেন।'

'আর চেষ্টা করে কিছু হবে না।'

বুলু চোখ বন্ধ করে ফেলল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ সময় একা একা বসে থাকা যায় না। মিজান সাহেব অফিসের ফাইল খুললেন। যদি টাকাটার কোনো হদিস পাওয়া যায়। ব্যাংক থেকে ছ'বছরের স্টেটমেন্ট নিয়ে এসেছেন। মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন। যদি এমন কোনো চেক বেরিয়ে পড়ে যার উল্লেখ খাতাপত্রে নেই। রেকর্ড হারিয়ে গেছে। অসম্ভব তো কিছু না।

বুলুর ঘুম ভেঙেছে। সে আগ্রহ নিয়ে তার বাবাকে দেখছে। মানুষটা কি অদ্ভুত! এর মধ্যে খাতাপত্র নিয়ে মগ্ন হয়ে গেছে। বুলু মৃদু স্বরে ডাকল, 'বাবা।'

তিনি চোখ তুলে তাকালেন।

বুলু বলল, 'ফেল করায় তুমি কি রাগ করেছ?'

মিজান সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ। একমাত্র গাধারাই তিনবার বি. এ ফেল করে।'

বুলুর কেন জানি হাসি পাচ্ছে। কি অদ্ভুত মানুষ তার এই বাবা। ছেলের এই অবস্থাতেও সান্ত্বনার একটা কথাও বলছেন না। আশ্চর্য তো। বুলু তাকিয়ে আছে। মিজান সাহেব আবার হিসাব নিকাশ শুরু করেছেন।

বুলুর আবার ঘুম পাচ্ছে।

অথচ ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না। পায়ের ব্যথা তীব্র হলেই ঘুম পায়। এই ঘুম স্বাভাবিক ঘুমের মতো নয়। অন্যরকম ঘুম। এই ঘুমের সময় আশেপাশের অনেক কিছু টের পাওয়া যায়। ঘুমের ঠিক আগে আগে মাথায় কোনো চিন্তা এলে সেই চিন্তা ঘুমের মধ্যেও থাকে। মাথার মধ্যে ক্রমাগত তা ঘুরপাক খেতে থাকে। একবার ঘুমুতে যাবার ঠিক আগমুহূর্তে মাথায় এল. তিনের ঘরের নামতা। তিন চারে বার, তিন পাঁচে পনের.....। মাথায় এই নামতা থেকেই গেল। ক্রমাগত কেটে যাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো মাথার গভীরে বাজতে থাকল— তিন চারে বার, তিন পাঁচে পনের, তিন ছয় আঠার......

এই ঘুম ও জাগরণ বড় অদ্ভুত। কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা বাস্তবে ঘটছে ঠিক বোঝা যায় না। বীণার সেই বন্ধুটি একবার তাকে দেখতে এসেছিল। সত্যি এসেছিল কিনা সে জানে না। হয়ত সে সত্যি–সত্যি আসে নি। হয়ত এটা কল্পনা। কিম্বা কে জানে

সত্যি–সত্যি হয়ত এসেছিল। অলিক ঘরে ঢুকেই বলল, 'আমার চিঠিটা কি আপনি পেয়েছিলেন?'

বুলু বলল, 'হ্যাঁ।'

'বীণা কি সত্যি–সত্যি আপনাকে চিঠি দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চিঠি পড়ে কি আমাকে আপনার খুব খারাপ মেয়ে মনে হল?'

'না।'

'আপনি কি হ্যাঁ এবং না ছাড়া কিছু বলতে পারেন না?'

বুলু হাসল। অলিক বলল, 'এখন বলুন, আপনার পায়ের অবস্থা কেমন?'

'অবস্থা বেশি ভালো না।'

'কেটে বাদ দিয়েছে?'

'এখনো দেয় নি। শিগ্‌গিরই দেবে।'

'ঐ কাটা পা আপনি তখন কী করবেন? সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?'

কি অদ্ভুত প্রশ্ন। অথচ মেয়েটার মুখে প্রশ্নটা মানিয়ে গেছে। মোটেই অদ্ভুত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এটাই খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন।

'কি কথা বলছেন না কেন? কাটা পা নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'আপনি কী করতেন?'

'আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। আমি কি আমার শরীরের এত বড় একটা অংশ ফেলে যাব নাকি?'

বুলু হেসে ফেলল। অলিক হাসল না। সে চোখ তীক্ষ্ণ করে বলল, 'যন্ত্রণা কি খুব বেশি?'

'হ্যাঁ বেশি।'

'অসহ্য যন্ত্রণা তাই না?'

'ঠিক অসহ্য নয়। সহ্য করতে পারি তবে অন্য একটা ব্যাপার হয় যা সহ্য করা যায় না।'

'বলুন তো শুনি।'

'আপনি শুনে কী করবেন?'

'আমার দরকার আছে। এই ব্যাপারগুলো আমার জীবনেও ঘটবে, কাজেই আগে থেকে আমাকে তৈরি থাকতে হবে।'

'মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিস আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।'

'বলেন কি?'

'এখন আমার মাথায় ঘুরছে তিনের ঘরের নামতা। তিন দুগুনে ছয়। তিন ত্রিকে নয়, তিন চারে বার, তিন পাঁচে পনের......'

অলিক হেসে ফেলল।

বুলু বলল, 'হাসছেন কেন?'

'নামতার বদলে একটা মজার কিছু আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয় ভাবছি।'

'মজার কিছু মানে?'

'ধরুন আমি যদি এখন আপনাকে বলি—I Love You. তাহলে ভালো হয় না? আপনার মাথার মধ্যে ক্রমাগত ঘুরবে— I Love You. I Love You. নামতার চেয়ে এটা ভালো না?'

এই জাতীয় কথাবার্তা বুলুর সঙ্গে কি সত্যি হয়েছিল? না পুরোটাই তার কল্পনা কিংবা স্বপ্নে দেখা দৃশ্য। অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নগুলো খুব বাস্তব হয়। স্বপ্নে বর্ণ থাকে গন্ধ থাকে।

বুলু ঘুমিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে লক্ষ করল ডাক্তার সাহেব ঢুকছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে তার পা দেখলেন। বুলু বলল, 'স্যার কি অবস্থা?'

ডাক্তার শুকনো গলায় বললেন, 'আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?'

'ভালো মনে হচ্ছে না।'

'দেখি আরেকটা অপারেশন হোক।'

'কবে হবে?'

'দু'এক দিনের মধ্যেই হবে। আপনি মনে সাহস রাখুন।'

'রাখতে চেষ্টা করছি। অপারেশনে কিছু না হলে কী করবেন?'

'পা এ্যামপুট করব।'

বুলু খুব সহজ গলায় বলল, 'কাটা পা কিন্তু আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব ডাক্তার সাহেব। আপনি যেন ওটা আবার ফেলে দেবেন না।'

ডাক্তার সাহেব শীতল চোখে বুলুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুলু ঘুমিয়ে পড়ল। এক সময় ঘুম ভাঙল। কতক্ষণ পর ভাঙল কে জানে? বাবা এখনো খাতাপত্রের ওপর ঝুঁকে আছেন। বুলু ডাকল, 'বাবা।'

মিজান সাহেব চোখ না তুলেই বললেন, 'কি?'

বুলু মনে করতে পারল না, বাবাকে সে তুমি করে বলে, না আপনি করে বলে। তার মনে হল সে আপনি করেই বলে। বুলু বলল, 'এত কিসের হিসাব নিকাশ করছেন?'

মিজান সাহেব ফাইল বন্ধ করে বললেন, 'অফিসের একটা হিসাব। লাখ দু-এক টাকার হিসাব মিলছে না।' বুলু তাকিয়ে আছে বাবার দিকে।

মিজান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'হিসাব মিলাতে পারছি না। গনি সাহেবের ধারণা আমি বোধ হয়—' তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল তাঁর নিজের মাথাও বোধ হয় এলোমেলো হয়ে আছে। ছেলেকে এইসব কথা বলার কী অর্থ থাকতে পারে। বুলু বলল, 'তুমি বাসায় চলে যাও বাবা। বাসায় গিয়ে ঘুমাও।'

বুলু লক্ষ করল সে তুমি করে বলছে। বাবা তাতে চমকে উঠছেন না। তার মানে সে হয়ত তুমি করেই বলত।

'বাবা।'

'কি?'

'আমি ঠিক করেছি আবার বি. এ পরীক্ষা দেব। এইবার পাশ করবই।'

'ভালো।'

'তুমি বাসায় চলে যাও। বাসায় গিয়ে আরাম করে ঘুমাও।'

'ওরা তো কেউ আসছে না।'

'চলে আসবে। আর না আসলেও কোনো অসুবিধা নেই।'

মিজান সাহেব বিড় বিড় করে বললেন, 'হিসাবটা মিলছে না, বুঝলি? কেন এ রকম হল বুঝতেও পারছি না।'

বুলু বলল, 'সব হিসাব কি আর সব সময় মেলে বাবা?'

১৫

গনি সাহেবকে আজ খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। অফিসে এসেই তিনি নিয়মের বাইরে একটা কাজ করেছেন। তাঁর সেক্রেটারিকে ধমক দিয়েছেন। অবশ্য ধমক দেয়ার পর–পরই নিজেকে সামলে নিয়ে হাসি মুখে বলেছেন, 'কাজ কর্ম কেমন চলছে?'

সেক্রেটারি শুকনো গলায় বলল, 'জ্বি স্যার ভালো।'

'তিন অক্ষরের সুন্দর একটা নাম বের কর তো।'

'কিসের নাম স্যার?'

'জাহাজের নাম। একটা জাহাজ শেষ পর্যন্ত কিনেই ফেললাম। নাম দরকার। রেজিস্ট্রেশন হবে। অনেক যন্ত্রণা আছে। মিজান সাহেব এসেছেন নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'যাও তাঁকে পাঠিয়ে দাও।'

মিজান সাহেব জাহাজ কেনার খবর চুপ করেই শুনলেন। কোনো রকম আবেগ বা উত্তেজনা দেখালেন না। গনি সাহেব বললেন, 'নাম দরকার মিজান সাহেব। জাহাজের নাম। সাধারণত জাহাজের নাম বেশ বড় হয় যেমন প্রাইড অব বেঙ্গল, দি সাইলেন্ট ভয়েজার......আমি চাই তিন অক্ষরের নাম।'

মিজান সাহেব এবারো কিছু বললেন না।

'তিন অক্ষরের নাম কেন চাই জানেন?'

'জ্বি না।'

'তিন সংখ্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্যেই তিন অক্ষরের নাম দরকার। তিন সংখ্যাটা কী রকম গুরুত্বপূর্ণ দেখুন— আমাদের স্থান হচ্ছে তিন—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। কালও তিন—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। আমরা খাই তিন বেলা—সকাল, দুপুর, রাত। শিয়াল ডাকে তিনবার তিন প্রহরে। ঠিক না?'

'জ্বি স্যার ঠিক।'

'জাহাজ কত দিয়ে কিনলাম কি—এইসব তো জিজ্ঞেস করছেন না।'

'জিজ্ঞেস করে কী হবে স্যার?'

'জাহাজ তো আমার একার না। প্রতিষ্ঠানের জাহাজ। এতে আপনাদের সবার অংশ আছে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আছে।'

মিজান সাহেব চুপ করে রইলেন। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

গনি সাহেব বললেন, 'আপনার ছেলের অবস্থা কি?'

'এখন একটু ভালো। আরেকটা অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার বলেছে হয়ত পা বাঁচানো যাবে।'

'গুড। ভেরি গুড। এটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। তা এরকম আনন্দের সংবাদে মুখ এমন কালো করে রেখেছেন কেন? অবশ্যি এ রকম হয়—খুব আনন্দের সময় মনটা কেন জানি খারাপ লাগে। চা খান চা দিতে বলি।'

'চা খাব না স্যার।'

মিজান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আপনি কি স্যার পুলিশ খবর দিয়েছেন?'

গনি সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। যেন তিনি প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। মিজান সাহেব বললেন, "রহমানের স্ত্রী আজ ভোরে আমার বাসায় এসেছিল। সে বলল, 'পুলিশ এসে রহমানকে ধরে নিয়ে গেছে'।"

গনি সাহেব বললেন, 'তাই নাকি? কখন ধরল?'

'রাত সাড়ে এগারটার সময়।'

'এখনো ছাড়ে নি?'

'জ্বি না।'

'অন্যায়। খুবই অন্যায়। রাতেই আমাকে খবর দেয়া দরকার ছিল। তৎক্ষণাৎ ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতাম।'

'স্যার আপনি কি পুলিশ খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ ইনফর্ম করে রেখেছিলাম। একেবারে তো ছেড়ে দেয়া যায় না। ছোট সমস্যা থেকে বড় সমস্যা হয়। আপনার ছেলের ব্যাপারটা দেখুন না। সামান্য কাঁটা ফুটল সেখান থেকে এখন পা নিয়ে টানাটানি। আমি পুলিশকে বলেছি ওরা যাবে, নিজেদের মতো করে একটা ইনভেসটিগেশন করবে। কিছু হবে না জানি। তবু পুলিশে ইনফর্ম করা নাগরিক কর্তব্য। আপনি ভাববেন না এক্ষুনি আমি রহমানকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। আমি একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি আপনি চিঠি নিয়ে নিজেই চলে যান। অফিসের গাড়ি নিয়ে যান।

গনি সাহেব অতি দ্রুত চিঠি লিখতে শুরু করলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'আমার কাছেও তো পুলিশ আসবে। আসবে না স্যার?' গনি সাহেব নরম গলায় বললেন, 'পুলিশ কি করবে না করবে বলা তো মুশকিল। এরা তো কখনো ঠিক কাজটা করে না। যেটা করার না সেটা করে। যেটা করা প্রয়োজন সেটা করে না। নিন এই চিঠি নিয়ে চলে যান।'

মিজান সাহেব বেরিয়ে যাওয়া মাত্র গনি সাহেব বেল টিপে তাঁর সেক্রেটারি মজনুকে ডাকলেন। মধুর গলায় বললেন, 'নাম পাওয়া গেছে?'

মজনু শুকনো গলায় বলল, 'জ্বি স্যার। একটা পেয়েছি।'

'বল নাম বল।'

'নাম হল—বদর।'

'কি বললে?'

'বদর।'

'নয় কোটি টাকা দিয়ে জাহাজ কিনেছি—তার নাম বদর। তুমি আমার সঙ্গে ফাজলামি কর? যাও নাম বের কর। আজ বিকেলে পাঁচটার মধ্যে এক হাজার নাম তুমি আমাকে দিবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'নামগুলি সব এ্যালফাবেটিকেলি সাজাবে। অ তে কিছু, আ তে কিছু এই ভাবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

লাঞ্চ টাইমের ঠিক আগে সবার কাছে একটা নোট গেল। যার বিষয়বস্তু হচ্ছে— কোম্পানি গ্রিক শিলিং মেরিনারের কাছ থেকে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ কিনেছে। এই ঘটনা কোম্পানির উত্তরোত্তর উন্নতির পরিচায়ক। ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কোম্পানির সকল কর্মচারীকে একটি করে ইনক্রিমেন্ট দেয়া হল। কোম্পানির উন্নতি মানেই কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নতি।

মিজান সাহেব রহমানকে নিয়ে ফিরেছেন। রহমানের সমস্ত গা ফুলে উঠেছে। ডান চোখের নিচে রক্ত জমে কালচে হয়ে আছে। মিজান সাহেব বললেন, 'তোমাকে মারল কেন?'

'রহমান নিচু স্বরে বলল, জানি না স্যার।'

'খুব বেশি মেরেছে?'

রহমান তার জবাব না দিয়ে বলল, 'স্যার আমি এখন বাসায় যাব না। আমার এই অবস্থা দেখলে চিনু খুব মন খারাপ করবে। আমার নিজেরো স্যার লজ্জা লাগছে।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'কল্যাণপুরে আমার মামার বাসা আছে। ঐখানে নিয়ে যান স্যার দুই একদিন থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় যাব।'

'তুমি কি এর পরেও গনি সাহেবের এখানে কাজ করবে?'

'যাব কোথায় স্যার? যাওয়ার তো কোন জায়গা নেই।'

মিজান সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'আমি চাকরি করব না বলে ঠিক করেছি।'

'কী বলছেন স্যার?'

'রেজিগনেশন লেটার লিখে অফিসে দিয়ে এসেছি। ওরা গনি সাহেবকে দেবে।'

'আপনার সংসার চলবে কী ভাবে স্যার?'

'না চললে চলবে না। তুমি কি একটা সিগারেট খাবে রহমান?'

'জ্বি না স্যার। আপনার সামনে খাব না।'

'নাও। কোন অসুবিধা নেই।'

মিজান সাহেব রহমানের পিঠে হাত রাখলেন। রহমান শব্দ করে কাঁদতে লাগল।

১৬

অনেকদিন পর ফরিদা আবার ঐ মেয়েটিকে দেখলেন। ঘোমটা দেয়া মেয়েটা, কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যা মাত্র মিলিয়েছে। আকাশ মেঘে ঢাকা বলে একটু বেশি অন্ধকার। তবু তার মধ্যেও মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা গেল। তিনি প্রথমে ভাবলেন বীণা। পর মুহূর্তেই মনে

হল—না এতো বীণা না। তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কে ওখানে?' মেয়েটা চট করে চাঁপা গাছের আড়ালে চলে গেল।

তাঁর বুক ধক করে উঠল। ঘরে তিনি এবং তাঁর শাশুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই গেছে বুলুর কাছে। বুলুর অবস্থা খারাপ হয়েছে। আজ তার পা কেটে বাদ দেয়া হবে। অপারেশন সন্ধ্যার পর পরই হবার কথা। তিনি যেতে চেয়েছিলেন যেতে পারেন নি। সকাল থেকেই বুকের ব্যথায় কাতর হয়েছেন। আজকের ব্যথাটা অন্য যে কোনো দিনের চেয়েও তীব্র। সন্ধ্যাবেলা একটু কমেছিল। নামাজের অজু করার জন্যে বারান্দায় এসে এই দৃশ্য দেখলেন। তিনি আবার কাঁপা গলায় বললেন, 'কে কে কে?'

তাঁর শাশুড়ি বললেন, 'কি হইল বৌমা?'

ফরিদা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'ভয় পেয়েছি। আম্মা ভয় পেয়েছি।'

'বৌমা ভয়ের কিছু নাই। আস আমার কাছে। আয়াতুল কুরসি পইড়া বুকে ফুঁ দিব। আস আমার কাছে গো মা।'

ফরিদার সমস্ত শরীর কেমন যেন জমে গেছে। তিনি নড়তে পারছেন না। চাঁপা গাছের আড়াল থেকে ঘোমটা পরা মেয়েটি আবার বের হয়ে এসেছে। ফরিদা স্পষ্ট দেখলেন মেয়েটা তার ঘোমটা ফেলে দিল। কি অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ে অথচ তাকে এত ভয়ংকর লাগছে কেন?

ফরিদা ক্ষীর্ণ স্বরে ডাকলেন, 'আম্মা ভয় লাগে। আম্মা ভয় লাগে।'

তাঁর শাশুড়ি ক্রমাগত ডাকছেন, 'আমার লক্ষী মা, কাছে আস। আমি বিছনা থাইকা নামতে পারতাছি নাগো মা। তুমি আমার কাছে আস।'

১৭

ডাক্তাররা মৃত রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে সাধারণত কোনো কথা বলতে চান না। কিন্তু এই ডাক্তার বললেন। অপারেশন থিয়েটারের বাইরের কাঠের বেঞ্চিতে বসে থাকা মিজান সাহেবের সামনে এসে স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আমি খুবই লজ্জিত।'

মিজান সাহেব বিড়-বিড় করে বললেন, 'লজ্জিত হবার কী আছে! চেষ্টার ত্রুটি যদি হত তাহলে লজ্জার ব্যাপার ছিল। চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি।'

ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন না দাঁড়িয়ে রইলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'মৃত্যুর সময় বুলু কি কিছু বলেছিল?'

'জ্বি না। ওর জ্ঞান ফেরে নি।'

এই প্রথম মিজান সাহেবের চোখে পানি দেখা গেল। তিনি রুমাল বের করে চোখ মুছে সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আমার এই ছেলেটা বড় ভালো ছিল ডাক্তার সাহেব। আমার মনে একটা ক্ষুদ্র আফসোস রয়ে গেল—আমি যে তাকে কতটা ভালবাসতাম এটা সে জানতে পারল না।'

ডাক্তার সাহেব স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। মিজান সাহেব বললেন, 'বুলু আপনাকে একটা উপহার দিতে চেয়েছিল। ওর ইচ্ছা ছিল অপারেশনের পর জ্ঞান যখন

www.Murchona.com

ফিরবে তখন সে নিজের হাতে আপনাকে দেবে। আমি উপহারটা নিয়ে এসেছি। আপনি যদি উপহারটা নেন আমি খুব খুশী হব। তেমন কিছু না। সামান্য একটা কলম। অল্প দাম।'

মিজান সাহেব পাঞ্জাবির পকেটে কলম খুঁজতে লাগলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি আপনার বাচ্চাদের কাছে যান। ওরা খুব কান্নাকাটি করছে। আসুন। আমার হাত ধরুন।'

১৮

অলিক আমেরিকা থেকে সুন্দর একটা চিঠি লিখেছে। চিঠিতে জীবনের চমৎকার সব ঘটনা এত সুন্দর করে লেখা। বার-বার পড়তে ইচ্ছা করে।

চিঠি শেষ করবার আগে বুলুর কথা লিখল। বীণার কথা লিখল। কি সুন্দর করেই না লিখল—

বীণা, তোর ভাইটা খুব ভালমানুষ ধরনের ছিল। ভাগ্যিস তার সঙ্গে আমার বেশি দেখা টেখা হয় নি। হলে নির্ঘাৎ প্রেমে পড়ে যেতাম। আর ওইরকম কিছু ঘটলে কি হত বল তো! দু'দিন মাত্র তার সঙ্গে দেখা। অল্প কিছু কথা হল তাতেই আজ আমার এমন কষ্ট হচ্ছে। জানি না তোরা কী করে সহ্য করছিস! কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের অসাধারণ তবুও তার একটা সীমা আছে। তুই লিখেছিস জ্ঞান ফিরবার পর নানান কথার এক ফাঁকে তোর ভাই আমার চিঠিটা পড়তে চেয়েছিল।

জানতে চেয়েছিল আমি কেমন আছি। আমার বড় আনন্দ হল যে এক জন মৃত্যুপথযাত্রী অন্য এক জনের কুশল জানতে চায়। সেই এক জন হচ্ছে আমার মতো এক জন। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। পরকাল আছে কিনা কে জানে। যদি থাকে তাহলে তোর আদরের ভাই সেখানে পরম সুখে থাকবে। এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

তোর বিয়ের কথা হচ্ছিল—সেই বিয়ে ভেঙে গেল জেনে ভালো লাগছে। তুই বিয়ে করলে ওদের এখন কে দেখবে? তোকে এখন হাল ধরতে হবে না? আমি জানি সেই হাল তুই শক্ত করে ধরবি। মেয়েদের নরম হাত মাঝে-মাঝে বজ্রের মত কঠিন হয়ে যায়। সময়ই তা করে দেয়। তোর বেলায়ও করবে।

আমি ভালো আছি। সত্যি ভালো। ডাক্তাররা অসুখ ধরতে পেরেছেন। দাগ মুছে যাচ্ছে। চাঁদে এখন আর কোন কলঙ্ক নেই।

চিঠি শেষ করে বীণা চুপচাপ বসে রইল।

শ্রাবণ মাসের দুপুর।

আকাশ মেঘলা। মেঘলা দুপুরে সব কেমন অন্যরকম লাগে। কুয়ার কাছের চাঁপা গাছে কর্কশ স্বরে একটা কাক ডাকছে—কা-কা-। কা-কা।

বীণার দাদী বললেন, 'মর হারামজাদা মর।'

কাক তাতে উৎসাহ পেয়ে আরো শব্দ করে ডাকতে লাগল—কা-কা-কা।

মিজান সাহেব বারান্দায় বসে বিড়-বিড় করে হিসাব করছেন। তাঁর খানিকটা মাথার দোষ হয়েছে। এমন ভয়াবহ কিছু না। বাইরের কেউ ধরতে পারে না। সবই ঠিকমতোই করেন। শুধু যখন বাসায় থাকেন তখন হিসাব করতে থাকেন। অফিসের না-মেলা হিসাব মিলাতে চেষ্টা করেন। হিসাব মেলে না।

এখন তিনি বারান্দায় জলচৌকিতে বসে অতি দ্রুত হিসাব করছেন।

বাবলু তাঁকে দেখছে। এখন বাবাকে তার আর মোটেই ভয় করে না। বরং বড় ভালো লাগে। বাবার সঙ্গে সে নানান গল্প করে।

বাবলু বলল, 'বাবা কি করছ?'

মিজান সাহেব বললেন, 'হিসাব।'

'মিলছে বাবা?'

'প্রায়। একটু বাকি।'

মিজান সাহেব হাসেন। এই হাসি বাবলুর বড় ভালো লাগে।

সেও হাসে।

ক্লান্ত দুপুরগুলোতে বীণা বসে থাকে কুয়ার পাশে। মাঝে-মাঝে কুয়ার কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'লুবু, লুবু।' কুয়া সেই শব্দ উল্টো করে ফেরত পাঠায়। কি সুন্দর প্রতিধ্বনি—বুলু, বুলু।

বীণার কাছে গানের মতো মনে হয়। অন্ধকারের গান।

www.Murchona.com

Andhokarer Gaan by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com